পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত যৌনপল্লী: যৌনকর্মীদের অবস্থান

A thesis submitted towards partial fulfillment of the requirements for the degree of

M Phil in Women's Studies

Course affiliated to Faculty of Interdisciplinary Studies, Law and Management
Jadavpur University

Submitted by

CHIRANJIT BISWAS

EXAMINATION ROLL NO.: **MPHFWS1902**

Under the guidance of

DR. NANDITA BANERJEE DHAWAN
Assistant Professor
School Of Women's Studies
Jadavpur University

School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata-700032
India
2019

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পাদন এবং পরিণতির জন্য একাধিক গুণীব্যক্তির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাই শুরুতেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের Assistant Professor Dr.Nandita Banerjee Dhawan কে। যাঁর ছত্রছায়ায় না থাকলে এ কাজ কোনভাবেই সম্ভব হত না। গবেষণা নিবন্ধে উল্লিখিত যাবতীয় তথ্য এবং ভাবনা বস্তুত তাঁর নির্দেনামা অনুসারে পূর্ণাঙ্গ আকার পেয়েছে। গবেষণা কাজের দিক নির্ণায়ক হিসাবে তাঁর এই ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়। কৃতজ্ঞতা জানাই মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের Director, Professor ড. ঐশিকা চক্রবর্তী মহাশয়াকে। গবেষণার জন্য নানা রকম তথ্য ও প্রুফ সংশোধন করে সাহায্য করেছে সোমদত্তা দি তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বন্ধু পর্ণব বিশ্বাসের সান্নিধ্যেই বর্তমান বিষয়টি নিয়ে কাজ করার প্রথম প্রাথমিক ধারনা পেয়েছিলাম তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই দেবেশ দাস কে যার সাহায্য ছাড়া যৌনপল্লীতে গিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক করা কোনভাবেই সম্ভব হতো না।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় লেখালেখি, বইপত্র ও পত্রিকার সাহায্য পেয়েছি যথাক্রমে, যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের ডিপর্টমেণ্টাল লাইব্রেরী, যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরী। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিক এবং কর্মচারীবৃন্দ সময় অসময়ে কাজের প্রয়োজনীয় বইপত্রের যোগান দিয়েছেন। লাইব্রেরীর কর্মীদের সহযোগিতার ফলে গবেষণা কার্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। ফলে তাঁদের কাছেও আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার জন্য ফিল্ডওয়ার্ক এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জেলার যৌনপল্লী গুলিতে সাহায্য পেয়েছি সেখানকার যৌনকর্মীদের, সেখানকার দোকানদার, ও সেখানকার মানুষদের যাদের

সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত না। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বপরি ধন্যবাদ জানাই আমার পিতা-মাতা ও পরিবারকে। যারা আমার খারাপ দিনগুলিতে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সাহস প্রদান করে গেছে। যাঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহ না পেলে এম.ফিল গবেষণা সোপান অতিক্রম করা সম্ভব হতো না।

Date: MAY, 2019 **CHIRANJIT BISWAS**

Place: Jdavavpur University **(Roll No.- MPHFWS1902)**

Kolkata

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা **১ - ২১**

প্রথম অধ্যায় **২২ - ৩২**

জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীগুলির ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায় **৩৩ – ৪৮**

জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের কাজ ও যৌনকর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায় **৪৯ – ৫৮**

যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অধিকার: আইন, স্বাস্থ্য

চতুর্থ অধ্যায় **৫৯ – ৭২**

যৌনপল্লীর বাইরের ও ভিতরের নেটওয়ার্ক

উপসংহার **৭৩**

গ্রন্থপঞ্জি **৭৪ - ৭৫**

ভূমিকা

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলাগুলিতে বিশেষত নারীপাচার ও নারীদেরকে ছলে, বলে ও কৌশলে যৌনপেশায় নিয়ে আসা আজকের দিনে প্রত্যেকটি কাগজের শিরোনাম হয়ে উঠেছে। এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নানা রকম গবেষণা ও অন্বেষনকার্য এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে চলছে। নারীদেরকে বলপূর্বক যৌনপেশাতে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে এক দল অসাধু, ক্ষমতাশালীব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা হল- দালাল, মুখিয়া, যৌনপল্লীতে অবস্থিত বাড়িগুলির মালিক, মালকিন, এমনকি মেয়েটির আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীও। এরা অবশ্যই একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়/আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েদেরকে বিক্রি করে টাকা অর্জন করছে তো, অন্যান্যরা যৌনকর্মীদের কষ্টার্জিত অর্থে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটাচ্ছে। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে (বিষেশত অনুন্নত গ্রামগুলি থেকে) প্রতারণার ফাঁদ পেতে বিভিন্ন কাজের লোভ দেখিয়ে মেয়েদেরকে পাচার করে এই যৌনপেশাতে ক্রমাগত নিয়ে আসছে। দালালতন্ত্র ব্যবস্থা এই অমানবিক ও হিংসাত্মক প্রথাকে প্রতিমুহূর্তে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে এবং তারা অর্থের বিনিময়ে মেয়েদেরকে এই পেশায় নিয়োজিত করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নারীপাচারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং অধিকাংশ নারী পাচারের দালালচক্র গ্রাম এবং শহরতলীতে সক্রিয় রয়েছে ও যৌন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে যেটা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

দেহব্যবসার জন্য ৩৫টি শহরে যে সংখ্যক মেয়ে বিক্রি হয়, তার ৫০ শতাংশই হয় কলকাতায়।[১] আর যে সংখ্যক মেয়ে কেনা হয়, তার মধ্যে ৪৭.৪ শতাংশ কেনা হয় কলকাতায়। নাবালিকা মেয়েদের পাচারের প্রায় ৪৫.৫ শতাংশই চলে কলকাতার মধ্যে দিয়ে। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, লোকালয়ের মধ্যে বাড়ি ভাড়া করে 'দালাল'-পাচারকারীরা থাকছে। আর পাচারের অন্যতম প্রধান করিডর হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন। রিপোর্ট অনুযায়ী, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলাদের, কিশোরী ও নাবালিকাদের যৌনবৃত্তির কাজে লাগানো হয়। নারীপাচার এটি শুধু রাজ্যের সমস্যা নয়, বরং গোটা বিশ্বে এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে নারী ও শিশু পাচারে এখন শীর্ষস্থানে পশ্চিমবঙ্গ। বিষয়টি নিয়ে ভারতের আইনসভার (পার্লামেন্ট) উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কৃষ্ণা রাজ বলেছেন, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু পাচারে প্রথম অবস্থানে ছিল। এই রাজ্যে ২০১৫ সালে ২ হাজার ৬৪ আর ২০১৬ সালে ৩ হাজার ৫৫৯ জন নারী পাচার হয়। এ ছাড়া ২০১৫ সালে ১ হাজার ৭৯২ আর ২০১৬ সালে ৩ হাজার ১১৩টি শিশু পাচার হয়। ১৯৮৮ সালের একটি সার্ভেতে ১৬০ জন যৌনকর্মীর থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২৩জন জানায় যে তারা নিজে থেকে এই পেশায় এসেছে, যেখানে ১৩৭ জনের দাবি যে এজেন্ট মারফৎ তারা যৌনব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছে।[2] IJM (International Justice Mission) এবং "মহারাষ্ট্রের শিশু অধিকাররক্ষা কমিশনের" যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী মুম্বাইয়ের অন্তত ১৫ শতাংশ বাণিজ্যিক যৌনপল্লিতে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে নাবালিকারা। মুম্বাইয়ের গ্র্যান্ট রোডে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক যৌনপল্লী রয়েছে

---

[১] "নারী ও সমাজকল্যাণ দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদন," ২০১৩-১৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

[২] "কলকাতা অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন," সার্ভে, ১৯৮৮।

(৪৪৫)। এর পরেই তালিকায় নাম রয়েছে ওই শহরের ভিওয়ান্ডি (৩৮৯), অন্ধেরী, ডোম্বিভালি, ভান্দুপ, চেম্বুর, উল্লাসনগর এবং কামাথিপুরা। অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মীর সংখ্যা সর্বাধিক পানভেলে (১৮.৭শতাংশ) এবং বোরিভালিতে (১২.৫শতাংশ)। দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিশোরীরা থাকে দালালদের নিশানায়। বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বেদিয়া প্রজাতির কিশোরীদেরও চাহিদা যৌন ব্যবসায় প্রবল। এদের ৭১ শতাংশেরই বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। N.C.R.B. (National Crime Records Bureau) -র সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১০ থেক ২০১৪ এই গোটা সময়টা জুড়েই, শিশুপাচার ও অপহরণের ঘটনার ক্ষেত্রে দেশগুলির তালিকায় প্রথম তিনটি স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অসম। অপেক্ষাকৃত গরিব অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে পাচার হয়ে যাওয়ার সংখ্যাটাই বেশি। কিন্তু এ ঘটনা সর্বাংশে সত্য নয়। গোটা বিশ্ব জুড়ে গবেষণা ও সমীক্ষার রিপোর্টে এটাও দেখা গিয়েছে, অনেক সময় গরিব এলাকার থেকে অন্য একটি গরিব এলাকার মধ্যেও নারী পাচার হচ্ছে। আসলে পাচার করার ব্যাপারটি পুরোপুরি পাচারকারীদের নিজস্ব সুবিধার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সুতরাং অনুন্নত জায়গা থেকে উন্নত জায়গাতেই যে সব সময় পাচার হয়ে থাকে তা বলা যায় না। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এক পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার তৎকালীন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট গোটা কলকাতা শহরে ৪০৪৯টি যৌনকর্মীদের ঘর আছে বলে স্বীকার করেন, যাতে বাস করছিলেন মোট ১২, ৪১৯ জন যৌনকর্মী। অর্থাৎ গৃহপ্রতি যৌনকর্মীর সংখ্যা ছিল ৩ জনেরও বেশি।[৩] এর পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, ভারতবর্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। বিশ্বায়নের থাবায় দিকে দিকে দারিদ্র্য আরো বেড়েছে,

[৩] সুধীর চক্রবর্তী, *যৌনতা ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: নবযুগ প্রকাশনী,২০১০।

বেড়েছে পাচার, বেড়েছে উন্মত্ততা। ফলে বর্তমানে শুধু কলকাতা শহরে যৌনকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে তা নয়, বেড়েছে জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লী গুলিতেও যৌনকর্মীর সংখা।

মেয়েদেরকে যৌনকর্মে নিয়ে আসার জাল ছড়িয়ে আছে সারা দেশ জুড়ে। যে যৌনপল্লীগুলি ভারতের বিখ্যাতযৌনপল্লী হিসাবে পরিচিত (যেমন-দিল্লীর জি.বি রোড, মুম্বাইয়ের কামাথিপুরা যা বর্তমানে রেড স্ট্রিট অফ বোম্বে হিসেবে পরিচিত, উত্তরপ্রদেশের নাটপুরা, বারানসীর শিবদাসপুর, গুজরাটের ওয়াদিয়া এবং কলকাতার সোনাগাছি) তার থেকে বাইরে অবস্থানরত বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলাভিত্তিক যৌনপল্লীগুলি মূলত আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতার মতো বিখ্যাত যৌনপল্লীগুলি নিয়ে কাজ করছে বেশ কিছু সংস্থা, N.G.O। সোনাগাছির যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা, আইনি অধিকার, বিমাব্যবস্থা, তাঁদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য দুর্বার ও সংলাপের মত N.G.O কাজ করে চলেছে। কিন্তু সীমান্তবর্তী জেলাভিত্তিক যৌনপল্লীর নারীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সচিব ভারতীদে-র কথায় ‘পশ্চিমবঙ্গের সব যৌনপল্লীতে এখনও আমরা পৌঁছাতে পারিনি।’ তাই পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের দেখলে শহরের যৌনকর্মীর তুলনায় তাঁদের অবস্থানকে বোঝা যাবে।

যৌনবৃত্তিবৃত্তির অন্যতম দিক হল পুরুষ আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে নারীদেহ ভোগ করবে। সেখানে নারীর যৌন চাহিদার প্রশ্ন অবান্তর। প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসন কে ভিত্তি করে এবং পবিত্র - অপবিত্র ও শুচি - অশুচি ধারণাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতি

গড়ে উঠেছে, তাতে শ্রেণী বৈষম্যের সাথে আরোও যুক্ত হয়েছে জাতিবর্ণ বৈষম্য। দেশের স্বাধীনতা, সংবিধান, নানাবিধ আইন প্রনয়ন এবং উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখনও এদেশে শ্রেণী এবং জাতিবর্ণের সাথে যৌনবৃত্তি এমনভাবে মিশে আছে যে একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করা প্রায় অম্ভব। যৌনকর্মীরা যেন বৈধ সমাজের বাইরের এমন এক এলাকার বাসিন্দা যেখানে অপরাধীদের বসবাস। এই কথাটি আরো বেশি ভাবে প্রযোজ্য হয়ে ওঠে যখন আলোচনার ক্ষেত্রভূমি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির যৌনপল্লী গুলিতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের অবস্থান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে।

যৌনকর্মী শব্দটি নতুন। “Sex worker” এর আভিধানিক অর্থ যৌনকর্মী। যৌন ব্যবসা পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা হলেও “যৌনকর্মী” এই শব্দের প্রয়োগ দেখান যৌনকর্মী লেখক নির্মাতা ও যৌনকর্মী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ক্যারল লেই ১৯৭৮ সালে। যৌনকর্মী শব্দের উৎস নিয়ে ক্যারল লেই (Carol Leigh) এর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলনে। অধিকার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ক্যারল লেই। ১৯৮৭ সনে Frederique Delacoste এবং Priscilla Alexander সম্পাদিত মহিলা যৌনকর্মীদের লেখা "Sex Work" নামক কবিতা সংকলন প্রকাশ হওয়ার পরে শব্দটি জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে, এরপর থেকেই থেকে যৌনকর্মী শব্দটি ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে, সরকারী-বেসরকারী এজেন্সী, বেসরকারী সংগঠন এবং এমনকি গবেষণা প্রবন্ধে, একাডেমিক পাবলিকেশনসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও শব্দটি ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি "sex-worker" শব্দযুগলের সংজ্ঞা Oxford English Dictionaryতে তালিকাভুক্ত। যৌনপল্লীর মেয়েরা নিজেদেরকে কর্মী বলেই মনে করে। যৌনকর্মী শব্দটির মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বা পেশাকে সম্মান দেওয়ার অভিব্যক্তি আছে

বলে ধারণা। একটা নির্দিষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই 'যৌনকর্মী' শব্দটির উদ্ভব। সেটি হল আইনি স্বীকৃতি। পেশার বৈধতা। বিপন্ন যৌনকর্মীদের সুরক্ষিত রাখতেই আইনি বৈধতা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সারা পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমাণ নারী এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বা হতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁরা যেভাবেই হোক তাঁদের শ্রমই বিক্রি করছে। আধুনিক সমাজের সব প্রেক্ষাপটেই নারীদের একাংশ যৌনতা বিক্রির মাধ্যমে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয় তাদের আয়ের উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকে নির্ভরশীল অনেক মানুষ। স্থানীয় অর্থনীতিতেও ব্যপক প্রভাব ফেলে এই কাজ। তাই এটি একটি পেশা এবং এই পেশাজীবীদের কর্মী বলাই শ্রেয়।

যৌনকর্মীদের এবং যৌনপেশাকে নির্মূল করা–না-করার প্রশ্নে, পুনর্বাসন প্রশ্নে,[৪] নৈতিকতার প্রশ্নে, ধর্মীয় প্রশ্নে, অধিকারের প্রশ্নে নানারকম তর্ক-বিতর্ক আমরা শুনে থাকি। অর্থশাস্ত্র মতে, বাজারে যদি কোনোপণ্যের চাহিদা থাকে তাহলে সে পণ্যের উৎপাদন রহিত করা যায় না। প্রকাশ্যে না-হলেও গোপনে তার উৎপাদন চলতেই থাকে। যৌনপণ্যের বাজারচাহিদা কমানো না-গেলেও চিহ্নিত "রেড লাইট এরিয়া" গুলিকে তছনছ করে দিলেও অন্য কোনো ছদ্ম-আবরণে এ ব্যাবসা চলতেই থাকবে। তাতে মাত্র একদল যাবে, একদল আসবে। নারীবাদীরা এ ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত এক ভাগের নারীবাদীরা যৌনবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে যৌন-নির্যাতন বা ধর্ষণ হিসাবে দেখেন। তাঁরাই চান এ ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হোক।

[৪] পুর্নবাসান হল যৌনকর্মীদের নূতন স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করন।

নারীবাদীদের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালে সুইডেনে একটি আইনও তৈরি হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল - যৌনতা বিক্রি কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু যৌনতা ক্রয় অবশ্যই অপরাধ। এই আইন যৌনসেবা ক্রয়ে ভোক্তাদের নিরুৎসাহিত করবে। আর ক্রেতা যখন থাকবে না তখন এটি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য পক্ষের নারীবাদীগন যৌনকর্মীদের অধিকার, নিজস্ব ইচ্ছা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে দেখেন। তাঁরা যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন, যথার্থ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করে যৌনপল্লী উচ্ছেদের বিরোধিতা করেন এবং এই যৌনপেশাকে কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলেন। যৌনব্যবসাতে নিয়োজিতদের যৌনকর্মীদের পতিতা, গণিকা, খারাপ মেয়ে ইত্যাদি না-বলে যৌনকর্মী এবং তাদের কর্মকে যৌনকর্ম বলার পক্ষে পৃথিবীব্যাপী তাদের আন্দোলনও চলছে। জার্মানিতে আইন সংস্কারের ফলে গত ২০০২ সালে সে দেশে যৌনকর্ম একটি নিয়মিত পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও ওই আইনে যৌনকর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সারা পৃথিবীতেই এই দাবিতে আন্দোলন সচল আছে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের "দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি" এবং বাংলাদেশের "দুর্জয় নারী সংঘ"ও এরকম দাবিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সারা পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমান নারী এই পেশার সঙ্গে স্বেছায় যুক্ত হয়েছে বা পাকেচক্রে যৌনব্যাবসায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে, তাঁরা যেভাবেই হোক তাঁদের শ্রমই বিক্রি করছে। এক দিনের বা এক মাসের নোটিসে এদের এ পেশা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন এনজিও এবং বিশেষজ্ঞরা যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের জোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মতামত দেন। কেননা যৌনবৃত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নারী পাচারের মতো জঘন্য ব্যবসা। বাংলাদেশ থেকে পাচার করা নারী ও শিশুদের কলকাতার সোনাগাছি, কালিঘাট, বউবাজার, সহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন

যৌনপল্লীতে বিক্রি করা হয়। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের বড়বাজারের পাশে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীতে ৮০০/১০০০ মেয়ের বসবাস। আর এর মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ জন বাংলাদেশি।[৫] জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীগুলিতে যৌন সমস্যা সমাধানে "উচ্ছেদ"ই প্রধান পন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যৌন হওয়ার পিছনে পূর্বের ও পরের অবস্থা বিবেচনা না করেই সমাজ তাদের বিতাড়িত করতে চায়। তাদের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে না কেউ। তাই বাইরের সমাজে স্থান পাওয়ার স্বপ্ন দেখেও না তারা সবসময়। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উচ্ছেদ ব্যবস্থা যৌনকর্মীদের কঠিন পরিস্থির দিকে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।

পেশা নির্বাচনের অধিকার সকলকেই রাষ্ট্র দিয়েছে। জোর করে কোনো পেশায় কাউকে নিয়ে আসার মানে তাঁর মানবাধিকার লঙ্ঘন-এর সামিল। সমাজে যেসব মেয়েদের নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয় কেউ, তখন সেই সংশ্লিষ্ট মেয়েটির জীবন মৃত্যুরই সামিল হয়। একই সঙ্গে ভারতী দে বলেন -

“যৌনপেশায় নামার জন্য প্রতি মাসে এখন ২০০ থেকে ২৫০ জন মেয়ে আমাদে কাছে আসে”। প্রাপ্তবয়স্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক, দুই ধরনের মেয়েরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৯৮ শতাংশ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৯৬ শতাংশ মেয়ে নিজের ইচ্ছায় যৌনপেশায় নামতে চাইছে। আমাদের বক্তব্য জানার পরে তাদের অনেকে এমন কথা বলে যে, আমরা তাকে সুযোগ দিচ্ছি না।” [৬]

---

[৫] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- তিথি সাহা, বয়স ২৪, ঠিকানা- ভালুকা গ্রাম, বর্তমান বাসস্থান- শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৬.২.২০১৯।

[৬] এই সময়, সংবাদ পত্রিকা, ১০ মার্চ, ২০১৪।

আর এই মেয়েরা তখন জেলার বিভিন্ন যৌনপল্লিতে স্থান পেয়ে যায়। দালাল দের সহযোগিতায়। এ ক্ষেত্রে সেভাবে আমাদের কিছু করার থাকে না। বহু অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলা জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লী গুলিতে নিজের ইচ্ছায় যৌনপেশায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে, তার পিছনে অন্যতম কারণগুলির মধ্যে দারিদ্র এবং বাড়িতে অশান্তির মতো বিষয়ও রয়েছে।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর, বাহাদুরপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের থেকে পাওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় যে এসব যৌনকর্মীরা এ পেশায় এসেছে বন্ধু ও প্রেমিকের প্রতারণার শিকার হওয়ার মাধ্যমে, কিছু মেয়ে দালালদের মাধ্যমে, আবার কিছু মেয়েরা দালালদের দ্বারা বিক্রি হয়ে, আত্মীয়দের দ্বারা বিক্রিত হয়ে এবং কিছু মেয়েরা নিরুপায় হয়ে নিজেরাই এ পেশায় আত্মসমর্পণ করেছেন। সত্য যে, এই বিপুল পরিমাণ যৌনকর্মীর অধিকাংশই যৌনদাসত্বের ফাঁদে আটকে গেছে। কিন্তু এই পেশা থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও পরবর্তী জীবনে সম্মানের সাথে টিকে থাকবার নিশ্চয়তা তাঁদের কেউই দেয় না। এমনকি সরকারও না। সমাজের ৯৯ শতাংশ মানুষই এঁদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। মরলে এঁদের সৎকারে পর্যন্ত সামাজিকভাবে বাধা দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি কার্যকর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করেই যৌনপল্লীপল্লি উচ্ছেদ করে দেওয়ায় চেষ্টা। অনেকে বাসাবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা করছে, কেউ কেউ আবার পথযৌনকর্মীর মতো জীবন বেছে নিয়েছে।

নারী আন্দোলনের মূল ইস্যুগুলির মধ্যে অন্যতম ইস্যু হিসাবে আমরা দেখেছি, নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতায়নের আন্দোলন, নারীর মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, নারীর বৈষম্য দূরীকরনের আন্দোলন, নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধের

আন্দোলন ইত্যাদ্যি। নারীসংগঠনগুলি যৌনকর্মীদের ইস্যু নিয়েও কাজ করছে, নারীবাদীরা যৌনকর্মীদেরকে নৈতিকতার দিক থেকে গ্লানিকর বা করুণার বস্তুরুপে উপস্থাপন করেনি বরং তাদেরকে নাগরিক সমাজের একটি অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছে। যে মুহুর্তে নারী বৈতনিক কর্মস্থলে প্রবেশ করে সেই মুহুর্তে নারীর জন্য সমাজের বেধে দেওয়া 'অন্দর বাহির' বিভাজন রেখাটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।[৭] যৌনকর্মকে কাজ বলা যাবে কিনা প্রশ্নটি শুধুমাত্র নারীর কাজকে ঘিরেই না বরং যৌনতার প্রকৃতি এবং কাজ হিসাবে যৌনবৃত্তির ব্যাপারগুলো এটাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। নারীর দুটি প্রধান ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রী এবং মাতা। দুটোই তার প্রজনন কর্মের সাথে জড়িত। এখানেই আছে যৌনতার প্রশ্নটি। যৌনতা বলতে আমরা বুঝবো যৌনক্রিয়া, কামনা এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রভৃতি। যেহেতু নারীর যৌনতাকে শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, তাই বিয়ের ভিতরেই কিভাবে যৌনতাকে সংগঠিত করা হয় তা নির্নয় করা গুরুত্বপূর্ণ নারীর যৌনতা একটি বৈবাহিক জীবনে গৃহস্থলী দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর যৌনখিদে নিবারন ও সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌনকর্ম পালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্কে স্ত্রীর কামনা বাসনা যদি পরিতৃপ্তি হয়ও – তবু বলতেই হয় বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সন্তান উৎপাদন এবং স্বামীর যৌনখিদে নিবারন করতে। এই অবস্থায় যৌন কর্মকাণ্ড নারীর জন্য পালনীয় কর্তব্য বা নিয়মিত আবশ্যিক কাজে পরিণত হয়। এখানেই যৌনকর্মীর সাথে একজন স্ত্রীর পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। এক জন যৌনকর্মী অর্থের বিনিময়ে যৌনসেবা প্রদান করে থাকে। অপরদিকে এক জন স্ত্রী বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী যৌনকৃতদাসীতে পরিণত হয়। তাই বলা যায় একজন যৌনকর্মী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বেঁচে

[৭] কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী শ্রেণী ও বর্ণ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান, এপ্রিল ২০০৯।

থাকার জন্য কোন পুরুষের অধীনে না গিয়ে নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন করছে তাই অবশ্যই সে একজন কর্মী হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। তাই যৌনকর্মীরা কর্মীই তারা পতিতা নয়। কিন্তু যৌকর্মীদের প্রতি সমাজের মানুষ বিরুপ ভাবাপন্ন যার ফলস্বরূপ যৌনবৃত্তির প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নৈতিক ভাবে শাস্তিমূলক। যৌনবৃত্তিকে দেখা হয় ভ্রান্ত অপরাধমূলক কাজ হিসাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে আবার অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেখানে যৌনবৃত্তিকে দেখা হয় নৈতিকতা হিসাবে। অর্থাৎ বিবাহের সীমানার মধ্যে যে সব পুরুষের যৌনবাসনা পুরন হয় না তাদের কামনা চরিতার্থের স্থান হিসাবে নারীর যৌনবৃত্তিকে দেখা হয়। দুটো দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধ হলেও নারীর যৌনতা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উভয়ের মনোভাব এক। এইভাবেই সৃষ্টি হয় আরেকটি সামাজিক বিভাজন যা বিশেষভাবে নারীর জন্য প্রযোজ্য।

যেসব নারীকে পুরুষের যৌনলালসা নিবারনের জন্য ব্যবহার করা হয় তারা হয়ে পড়ে করুনা আর সহানুভূতির পাত্রী। অপহরণ, প্রতারনা, দারিদ্র বা অসহায়তার গল্পের মধ্যে যৌনবৃত্তির আসলরূপ ঢেকে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনরত কর্মীদের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে যৌনকর্মীরা দাবি করছেন কখনো কখনো যৌনবৃত্তি ভালো জীবনযাপনের জন্য দরকার বা অন্যান্য বিশেষ করে সরকারি উদ্ধারকারীদের গৃহীত পুনর্নবাসন কর্মসূচির চেয়ে অনেক ভালো। সমাজ কাঠামোতে নারীর যৌনতা ও যৌনবৃত্তি যা কিনা সমাজে নারীর অবস্থানকে সুসংহত করে এ দুটি বিষয়ে প্রচলিত ধারনা সর্ম্পককে এ পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। যৌনবৃত্তি বিবাহ বা একগামিতা ভাব ধারার সঙ্গে অভিন্ন। বিয়েকে মুদ্রার একপিঠ ভাবা হলে যৌনবৃত্তিকে তার উল্টোপিঠ ভাবা যায়। উত্তরআধুনিক নারীবাদী বিতর্কে যৌনবৃত্তিকে অবাধ যৌনঅভিব্যক্তির স্থান হিসাবে দেখা

হয়। যৌনকর্মীরা বলেন যৌনবৃত্তির বাইরে অবস্থানরত নারীদের চেয়ে তারা বেশী স্বাধীন। ব্যবসায়িক যৌনতার সঙ্গে স্বেচ্ছা যৌনকর্মের অর্থাৎ প্রেমিক বা বিশেষ খদ্দেরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্যকরণের প্রবনতা দেখা গেছে। যৌনবৃত্তিকে নারী যৌনতা মুক্তির স্থান বা প্রচলিত রীতিনীতির অনুমদিত স্থান হিসাবে বিবেচনা করা কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে এটা বিবাহের অপর পিঠ, যৌনপল্লী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে যৌনকর্মীরা কাজ করে যৌনকর্মী হিসাবে।

যৌনকর্মীদেরকে নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষনের ফলে বিভিন্ন দিক উঠে আসে, নারীবাদীরা যৌনকর্মীদের বিভিন্নবিষয় কে বিশ্লেষণ করে উপলব্ধী করেছে যে যৌনকর্মীরা তাঁরা তাঁদের সব কথা বলছে না। বিশেষত সীমিত কিছু কথার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকছে। যৌনকর্মীরা যে বিষয় গুলি বলছে না সেই যায়গাগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার আছে বলে মনে করছে নারীবাদীরা। কারন এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল, কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যৌনকর্মীরা নীরব থাকছে, সেই সাইলেন্সকে না বোঝাগেলে নারীবাদীরা যেভাবে যৌনকর্মীদের বিশ্লেষণ করছে সেটা গুরত্বপূর্ণ হয়ে যাবে।[৮] নারীবাদীরা যৌনকর্মীদের দেখছে এবং নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করছে সেখানে আরো কিছু বিতর্ক থাকতে পারে। সেই কারনে যৌনকর্মীদের মতামতকে বোঝা দরকার। যৌনকর্মীরা নিজেদের জীবনকে যৌনপল্লীতে কাটানোর ফলে পুরো বিষয়টি যে দুঃখ, যন্ত্রনা, কষ্টের মধ্যদিয়েই চলছে সেটাও না। এই বিষয়গুলি ঢাকাপড়ে যাচ্ছে। এই বিষয়

---

[৮] Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar Hemant Apte (Edited by), Prostitution and Beyond An Analysis of Sex Work in India, SAGE Publication, New Delhi, 2008

গুলিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আবার যৌনকর্মীদের মানসিক আঘাত, হিংস্রতা, টাকাপয়সার ক্ষেত্রে জোর-জুলুম, বলপূর্বক কিছু ঘটনা তাদের প্রত্যেক দিনের জীবনের একটা অঙ্গ তৈরি হচ্ছে সেই বিষয় গুলিও দেখা দরকার। নারীবাদীদের যে চিন্তা সেটা একটা মিডিলক্লাস দৃষ্টিকোন থেকেই দেখা হচ্ছে। তাদের মধ্যেও যৌনতাকে ভিত্তিকরে একটা হমোফবিয়া দেখা যাচ্ছে। নারীবাদীরা নির্দিষ্ট কিছু যৌনকর্মীদের নিয়ে কথা বলছে সমস্ত যৌনকর্মীদের নিয়ে কথা বলছে না। অনেক নারীবাদীরা কিন্তু বিবাহকে অস্বীকার করছেন না। বিবাহকে দেখা হচ্ছে দৈহিক কামনা চরিতার্থের উপায় হিসাবে। ফলে বিবাহ বর্হিভূত যে শারীরিক সম্পর্ক গুলি রয়েছে সেগুলিকে তারা সঠিক ভাবে এড্রেস বা চিহ্নিত করতে পারছে না। নারীবাদী আন্দোলনে যে সমস্ত আন্দোলন কারী রয়েছে তারা বিবাহটাকে ভালোকিছু হিসাবেই দেখছে যৌনতাকে এখানে স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। এই বক্তব্যটা দুই ভাবে সমস্যা জনক -

১) এর ফলে পুরুষ তান্ত্রিক যে পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই যথার্থ বলে প্রমান করছে।

২) যৌনতার ব্যাপার যখন আসছে তখন বিবাহের মধ্যে আবদ্ধ মধ্যবিত্ত যৌনতার কথা বলছে।

বিবাহ সম্পর্কের বাইরে যে মেয়ে বা পুরুষরা রয়েছে তাদের যৌনতা সম্পর্কে কি চিন্তাভাবনা সেটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না।

Radical Feministরা আবার Pornography এবং Prostitutionএর মধ্যে তুলনা তুলে ধরেছে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা বলছে যে পর্নগ্রাফিতে জোর এবং বলপূর্বকের একটা স্থান রয়েছে যা অর্থের বিনিময়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। এখানে কাজ করছে চিরাচরিত একধনের মেল ফ্যানণ্টাসি। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক কল্পনার মধ্যদিয়েই একজন পুরুষ (দর্শক) একজন

মেয়েকে দেখছে। একটি পুরুষ তার নিজের ইচ্ছামত একটি মেয়েকে ব্যবহার করছে। সে জন্য Radical Feministদের বক্তব্যে বলা হচ্ছে Pornography এবং Prostitutionএর মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। যেখানে মহিলাটাকে বলা হচ্ছে প্রথমে রেজিস্ট করার ভান করতে দর্শকের আনন্দের স্বার্থে, মেয়েটি কিন্তু আসলে রেজিস্ট্র করছে না বরং সারেন্ডার করছে কিন্তু এই বিষয়টি সেক্সটাকে স্বীকৃতি মূলক করে দিচ্ছে না। তাই Radical Feministরা Pornographyকে Prostitutionএর উপাদান হিসাবেই দেখছে। জোর বা বলপূর্বক বিষয়কে টাকার মাধ্যমে ঢেকে রাখা হচ্ছে। এই বিশ্লেষন অনুযায়ী সমস্ত Pornography আসলে নিপিড়ন মূলক, বলপূর্বক এবং মহিলা বিদ্বেষী যেমনটা Prostitution। সেই জন্যই Pornography আর Prostitution কে একই ভাবে দেখেছে Radical Feministরা। যৌনপল্লীর যে মহিলারা বলছে তারা নিজে থেকেই এই পেশাই এসেছে, বা তারা এখান থেকে আর ফিরে যেতে চাই না এরা মিথ্যা একটা চিন্তাধারাকে বহন করে চলেছে ফলে ওরা যা বলছে সেটা ঠিক বলছে না এটা Radical Feministদের বক্তব্য। আর মেকিনন এর মতে "যে সমস্ত যৌনকর্মীরা নিজেদেরকে স্বাধীন বলে মনে করছে তারা আসলে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার মাধ্যমে প্রতারিত হছে, তাই তারা তাদের নিপীড়ন টাকে বুঝতে পারছে না"।[৯] কিছু যৌনকর্মী বলছে তারা স্বাধীন, Radical Feminismএ কিন্তু এই দিকটা ধরা পরেও না। অন্যান্য Feministরা বলছে Prostitution বিষয়টাই Violence। এর মধ্যে এতকিছু Violence আছে (মানসিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা) যাকে অস্বীকার করা যাবে না।

---

[৯] Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar Hemant Apte (Edited by), Prostitution and Beyond An Analysis of Sex Work in India, SAGE Publication, New Delhi, 2008, pp 21-36

চিরাচরিত নারীবাদী বিশ্লেষন যৌনবৃত্তিকে কেবলমাত্র হিংস্রতার জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করছে, এই চিন্তাধারাটি মূলস্রতের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে যেখানে Familyকে হিংস্রতা ও নিপীড়নের জায়গা হিসাবে ধরা হচ্ছে না। যৌনবৃত্তিতে অংশগ্রহনকারী মহিলাদের প্রথমেই তাদের জাগতিক চাহিদা (Material needs) গুলিকে পর্যালোচনা করতে হবে। DMSC (Durbar Mahila Samanwaya Committee) যৌনবৃত্তি এবং বিবাহের পার্থক্য গুলিকে তুলে ধররেছে।[১০] বেশিরভাগ পরিবারই শেয়ারিং এবং ভালবাসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যৌনকর্মীরা বিবাহকে দুইভাবে দেখছে –

১) একজন বিবাহিত মহিলার জীবনে কিছু সুবিধা থাকে যেমন - স্বীকৃতি, সুরক্ষা যেটা যৌনকর্মীদের থাকে না।

২) অন্যদিকে বিবাহিত মহিলাদের তুলনায় যৌনকর্মীদের কিছু সুবিধা আছে, বিবাহিত মহিলারা যৌনকৃতদাসী যারা খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য স্বামীর উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

DMSC (Durbar Mahila Samanwaya Committee) এই চিন্তা কোন না কোন ব্যক্তির বা গ্রুপের কাছে প্রতিভাত হয়েছে ‘Necessary Evil’ হিসাবে।

Feministদের ‘Rotterdam Conference’ এ কিন্তু কোন যৌনকর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। Kathleen Barry ছিলেন Chief Organizer। তিনি বলছেন এটা নারীবাদীদের

---

[10] Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar Hemant Apte (Edited by), Prostitution and Beyond An Analysis of Sex Work in India, SAGE Publication, New Delhi, 2008

conference। তিনি চাইছে না এখানে Prostitutes দের বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা হোক। শুধু তাই নয় তিনি যৌনকর্মীদের প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি সমর্থন করতে চাইছেন না। এবং তার সাথে সাথে বলছেন এটা ঠিক নয় যে নারীদের যৌনদাসত্ব বা যৌনবৃত্তির মত একটা বিষয় যদি একটি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা হয় তাহলে সমাজের কাছে আমাদের যে ভাবমূর্তি আছে সেটা নষ্ট হতে পারে। ওই conferenceএ যোগ দিতে আসা যৌনকর্মীদের বক্তব্য হল, যৌনবৃত্তির বীরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই যে তারা আলদা হয়ে থাকছে শুধু তাই নয়, তারা এতোটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে তাদের সাথে সমাজের কোন সরাসরি সম্পর্ক থাকছে না। তেমন ভাবে তাদের নিজেদের পারস্পারিক বোঝাপাড়ার জায়গাটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৬-১৯৮৭ এই সময় গ্রেট ব্রিটেনে Prostitutes দের বিরুদ্ধে যে আওয়াজ উঠেছিল সেখানে কিন্তু কোন Feministকে যৌনকর্মীর হয়ে কথা বলতে দেখা যায়নি।[১১] নারীবাদীরা যখন মহিলাদের অন্য সকল সামাজিক দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলনরত তখন সেইভাবে যৌনকর্মীদের দাবীগুলি নিয়ে সোচ্চার হচ্ছে না। যৌনকর্মীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন ও দেখা যাচ্ছে না। নারীবাদীরা বলতে চাইছে যৌনকর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলা যেন একটা অবৈধ বিষয়কে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে। আবার উত্তর আধুনিক নারীবাদীরা যৌনকর্মীদের বিষয়ে বলছে যৌনকর্মীদের নিজের যৌনতা বিষয় কেন্দ্রিক সমস্ত কিছু নিজেরাই নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। সেটাই সেই বিষয়কে political identity দেবে। ভারতীয় নারীবাদীরা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে দেখছে যে উত্তরআধুনিক নারীবাদীরা আইনগত ভাবে যৌনকর্মীদের স্বীকৃতি দিতে চাইছে, তা তৃতীয়

---

[১১] Rajeswari Sunder Rajan, The Scandal of the State, Pauls Press, New Delhi, 2003

বিশ্বের দেশ গুলিতেই সম্ভব। আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সেই স্থানে দাড়িয়ে স্টেট তাদেরকে রাজনৈতিক পরিচয়পত দিতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুর, বাহাদুরপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীর কথা তুলে ধরা হয়েছে গবেষণার মাধ্যমে। একই সঙ্গে গবেষণার মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছে এই যৌনপল্লীগুলিতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রা, তাদের কাজ, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের অধিকার, জীবনের নানা শোষন ও বঞ্চনার দিকটি। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মোট তিনটি স্থানের যৌনপল্লী এবং যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জেলা ভিত্তিক যৌনপল্লীগুলি মূলত আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

গবেষনার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি হল

১) যৌনপল্লীগুলিতে আসার আগে মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কি রকম ছিল? যৌনপল্লীতে আসার পরে তাদের অবস্থান কি পরিবর্তন ঘটেছে?

২) কিভাবে মেয়েরা যৌনপেশাতে জড়িয়ে পরছে? তারা কি ধরনের পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে যৌনপল্লীর যৌনকর্মী হয়ে উঠেছে?

৩) মেয়েদের যৌনপল্লীতে নিয়ে আসার পিছনে দালালদের কি ধরনের নেটওয়ার্ক বা শক্তির প্রভাব কাজ করেছে?

৪) যৌনপল্লীতে এসে মেয়েরা কি যৌনকর্মকে পেশা হিসাবে বেঁছে নিয়েছে নাকি তাদেরকে বলপূর্বক যৌনবৃত্তির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে?

গবেষনা পদ্ধতি

জেলাভিত্তিক যৌনপল্লীগুলির যৌনকর্মীদের নিয়ে গবেষণা করতে হলে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক ধৈর্যের, নিরপেক্ষদৃষ্টিভঙ্গির, যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সংবেদনশীল মনোভাবের। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যৌনপল্লীগুলির যৌনকর্মীদের সাথে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সাক্ষাতকার গ্রহন করা হয়েছে। যৌনকর্মীদের থেকে পাওয়া তথ্য বা উত্তর লিখে নিতে হয়েছে। যৌনপল্লীতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশকিছু বাধারও সন্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন যৌনকর্মীদের পরিচিত ব্যক্তিরা সাক্ষাত প্রদানের সময় এসে সাক্ষাৎকার বন্ধকরতেও বলেছে, কিন্তু যৌনকর্মীরা তাদেরকে সাক্ষাৎকারের কারন বললে, যৌনপল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তখন সাক্ষাৎকার নিতে আর বাধা দেয় নি। যৌনপল্লীতে আসা একজন ট্রাক ড্রাইভার দেবেশ দাসের (ছন্মনাম) সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শান্তিপুরের যৌনপল্লী ও বাহাদুরের যৌনপল্লী সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীগুলির যে যৌনকর্মীদের থেকে সাক্ষাৎকার পাওয়া গেছে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল

ক্রমিক নং	**নাম (ছদ্মনাম)**	**বয়স**	**বর্তমান বাসস্থান**	**আদি বাসস্থান**	**জেলা**	**জাতি**	**কাস্ট**
1.	তিথি সাহা	২৪	শান্তিপুরের যৌনপল্লী	ভালুকা গ্রাম	নদীয়া	হিন্দু	SC
2.	পূর্ণিদাস	৩২	শান্তিপুরের যৌনপল্লী	বড়জিয়াকুরের বাসডোম গ্রাম	নদীয়া	হিন্দু	SC
3.	রীতা কর্মকার	৫২	শান্তিপুরের যৌনপল্লী	চাপড়াগ্রাম	নদীয়া	হিন্দু	SC
4.	শেফালি মাহাতো	৫৪	শান্তিপুরের যৌনপল্লী	শান্তিপুর	নদীয়া	হিন্দু	SC
5.	তাপসী জোয়াদ্দার	২৭	শান্তিপুরের যৌনপল্লী	গোবিন্দপুর	নদীয়া	হিন্দু	SC
6.	হাসিনা মন্ডল	৫০	মুর্শিদাবাদের যৌনপল্লী	লালগোলা	মুর্শিদাবাদ	মুসলিম	OBC-A
7.	আয়েশা শেখ	৩৫	মুর্শিদাবাদের যৌনপল্লী	জিয়াগঞ্জ	মুর্শিদাবাদ	মুসলিম	OBC-A

8.	রুবিয়া মন্ডল	৪৫	মুর্শিদাবাদের যৌনপল্লী	বেলডাঙ্গা	মুর্শিদাবাদ	মুসলিম	OBC-A
9.	লিপি মন্ডল	৫২	মুর্শিদাবাদের যৌনপল্লী	আজিমগঞ্জ	মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	GEN
10.	বুল্টি সর্দার	৪০	বাহাদুরপুরের যৌনপল্লী	কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি	নদীয়া	হিন্দু	ST
11.	টুম্পা মন্ডল	৩৬	বাহাদুরপুরের যৌনপল্লী	জালালখালি	নদীয়া	হিন্দু	SC
12.	যমুনা দুর্লভ	৫২	বাহাদুরপুরের যৌনপল্লী	নাকাশিপাড়া	নদীয়া	হিন্দু	ST

অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীগুলির ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়ের মধ্যেদিয়ে নদীয়া জেলার শান্তিপুর, বাহাদুরপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারি সংলগ্ন ভাগীরথীর তীরে যৌনপল্লী গুলি কি ভাবে গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের কাজ ও যৌনকর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেলার যৌনপল্লীগুলিতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবন জীবিকার কথা বলা হয়েছে। যৌনপল্লীতগুলিতে যৌনকর্মীদের ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয়েছে। যৌনপল্লীর ভিতরের যে পরিবেশের কথা সেই দিকটিও বিষদ ভাবে বলা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অধিকার: আইন, স্বাস্থ্য

এই অধ্যায়ে জেলার যৌনকর্মীদের দাবী, তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনা এবং যৌনব্যবসা ও যৌনকর্মীদের আইনের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: যৌনপল্লীর বাইরের ও ভিতরের নেটওয়ার্ক

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মেয়েরা কিভাবে প্রতারিত হয়ে, পাচার হয়ে জেলার যৌনপল্লীগুলিতে চলে আসছে। পাচারকারী ও যৌনপল্লীর দালালদের বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে এই গবেষণা কাজের মধ্যেদিয়ে নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলার যৌনকর্মীদের অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীগুলির ইতিহাস

ক. শান্তিপুর:

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের বড়োবাজারে অবস্থিত যৌনপল্লী, বাহাদুরপুরে অবস্থিত যৌনপল্লী এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারি সংলগ্ন ভাগীরথীর পাড়ে অবস্থিত যৌনপল্লীর কথা মূলত আমার অলোচনার বিষয়, একই সঙ্গে এই সমস্ত যৌনপল্লীগুলিতে অবস্থারত যৌনকর্মীদেরকে জীবনের নানা দিক কে তুলেধরা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে। কিন্তু তার আগে এই যৌনপল্লীগুলোর ইতিহাস উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর একটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক গঙ্গা তীরবর্তী জনপদ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের বড়োবাজারের গা ঘেসে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীর বিস্তার অনেকটা স্থান জুড়েই। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশেই এই যৌনপল্লীটির অবস্থান। অপর দিকে রয়েছে গঙ্গা নদীর ফেরিঘাট। এই গঙ্গা নদীর অপর পাড়ে বর্ধমান জেলার কালনা ও হুগলী জেলাস্থিত গুপ্তিপাড়ার সাথে শান্তিপুর নৌকাপথে যুক্ত। শান্তিপুরের বড়োবাজারে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীর ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রায় ১৫০ বছরের পুরোনো যৌনপল্লি এটি। মূলত এখনে গোস্বামীদের মন্দিরে আশ্রয়রত দেবদাসী ও বিধবা মহিলাদের দিয়ে এই যৌনপল্লীর সুত্রপাত বলা যেতে পারে লোকমুখে প্রচলিত কথা অনুসারে। কেননা এখানে ২০০/৩০০ বছর আগে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মন্দির রয়েছে যেমন, অদ্বৈতপাড়ায় অদ্বৈতপ্রভুর মন্দির ও গোকুলচাঁদের আটচালা মন্দির,

পোড়ামাটির কারুকাজযুক্ত জলেশ্বর শিবমন্দির, বউবাজার পাড়ায় আছে দক্ষিণাকালীর পঞ্চরত্ন মন্দির, এই মন্দিরে দেবদাসী প্রথা বিরাজমান ছিল এবং পরবর্তি কালে দেবদাসীদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এরা অনেকেই বড়োবাজার সংলগ্ন এলাকাতে বসবাস করতে থাকে। স্থানটিও ছিল নির্জন সাধারন মানুষের বসবাসের এলাকা থেকে বাইরে। একই সঙ্গে বড়োবাজারের কাছাকাছি ছিলো গঙ্গা নদীর ফেরিঘাট। নৌকাপথে যাতায়াতের সুবিধা ছিল সেই কারনেই এখানে গড়ে উঠেছিল অনেক বিধবা ও বয়স্ক দেবদাসীদের বাসস্থান। সত্তর এর দশক বা নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে শান্তিপুরের বড়োবাজারে গড়ে ওঠা ছোট ছোট ঘরগুলি সাধারন ভাবে যৌনপল্লীর রুপ পায়। উক্ত স্থানে বহুকাল আগে থেকেই যৌনবৃত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বসবাস করতো এবং অবৈধ যৌনপল্লী হিসেবে ভাবে কার্যক্রম চলে আসছিলো। শান্তিপুরে যৌনপল্লী গড়ে ওঠার এই মোটামুটি ইতিহাস, লোক মুখে প্রচলিত। এছাড়া শান্তিপুরের এই যৌনপল্লী গড়ে ওঠা নিয়ে এখানকার লোকমুখে প্রচলিত নানা কথা শোনা যায়। বর্তমানে নদীয়া জেলাতে শান্তিপুরের যৌনপল্লীর পরিচিতি আছে জেলার মানুষের কাছে। শান্তিপুরের যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের কাছে থেকে পাওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় প্রায় আটশো বা হাজার জন যৌনকর্মী বসবাস করে এবং প্রতিদিন প্রায় ৮০০/১০০০জন যৌনকর্মী থেকে ৭০০/৮০০ জন ব্যক্তি এখানে যৌনসেবা নিতে আসে। এখানে সবচেয়ে বেশী পরিমানে খরিদ্দার আসে বিশেষত শন্তিপুরের রাস উৎসবের সময়।[১২] তাই বলা যায় যে শান্তিপুরের এই উৎসবই ছিল এখানকার যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অর্থ উর্পাজনের সময়। এই সময় খরিদ্দারের চাহিদা থাকে প্রবল। যে কারনে এই সময় বর্ধমান জেলার কালনার যৌনপল্লী থেকে মেয়ে আমদানি

[১২] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুর যৌনপল্লী, ৪ফেব্রুয়ারি ২০১৯

দালালরা করে থাকে, এর ফলে লাভবান হয় বাড়ির মালিক ও মালকিনরা, তাদেরও আর্থিক লাভ ঘটে। উৎসব শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার তারা তাদের আগের যৌনপল্লীতে ফিরে যায়। উৎসব শেষ হয়ে গেলে এখানকার যৌনকর্মীদের আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়। এমনি সময়ে সাধারন মজুর, শ্রমিক, ব্যবসাদাররা, এলাকার সাধারন মানুষ এই যৌনপল্লীর খরিদ্দার। যেহেতু যৌনপল্লীটি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থানরত সেই জন্য বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভাররা এখানকার খরিদ্দার হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে বাইপাস হয়ে যাওয়ার কারনে এখানে এই গাড়ির ড্রাইভারদের মতো খরিদ্দারদের সংখ্যা অনেক কমে আসে। ফলস্বরূপ এখানকার যৌনকর্মীদের পথযৌনকর্মী হিসাবেও কাজে যেতে হতো। বর্তমান সময়ে এখানকার যৌনকর্মীরা পথযৌনকর্মী হিসাবে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। যৌনপল্লীর অপরপ্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গানদী। এক সময় নৌকার মাঝিমল্লা ও নৌকা পথে যাতায়াত করা যাত্রীরা ছিলো এখানকার খরিদ্দার, বর্তমানে সেই সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। কেননা সেই সময় জলপথেই ব্যবসা বানিজ্যের কাঁচামাল আসতো শান্তিপুরের উপর দিয়ে ফলে এই রকম স্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো শান্তিপুরের যৌনপল্লী। এক দিকে যেমন ছিল গঙ্গার ঘাট অপর দিকে তেমনি জাতীয় সড়ক ছিল যৌনপল্লীর সংলগ্ন ফলে যৌনপল্লী গড়ে ওঠার এটাই ছিলো সবথেকে উপযুক্ত স্থান। দেশভাগের সময় বহু মানুষ যখন এপার বাংলাতে চলে আসে তখন অনেক অসহায় মেয়ে ও কিন্তু স্থান পায় এই যৌনপল্লীতে।

লোকমুখে শোনা যায় যে শান্তিপুরের অনেক বনেদী পরিবার ও এখানকার জমিরভূস্বামীরাও বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ির পুরোহিত দ্বারা ভোগ্য মেয়েরা অনেকেই এখানে অশ্রয় নিতো। এখানকার অনেক মেয়ে ভূস্বামী দ্বারা প্রতিপালিত এদের অর্থতেই কিছু চুন সুরকির ঘর গড়ে উঠেছিলো

যেগুলি এখন বর্তমান রয়েছে এবং এখনো যৌনকর্মীদের পরবর্তী প্রজন্মরা যৌনব্যবসা চালাচ্ছে। এই যৌনব্যসা কবে থেকে চলছে তার সাক্ষী যেন এই প্রাচীন ঘরগুলি। এখন যদিও শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে প্রাচীনতার ছাপ সেই ভাবে চোখে পড়ে না তবুও কিন্তু এখানে অল্প কিছু প্রাচীন চুন সুরকির ঘরগুলি বিদ্যমান রয়েছে। আগের সময়ে যে যৌনকর্মীরা ছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের কিছু ঘর রয়েছে তাদের প্রভাব এই যৌনপল্লীতে বেশ প্রবল। এরা যৌনকর্মী হিসাবে এখানে কাজ না করলেও বহুল পরিমানে যৌনকর্মীদের ঘরভাড়া দিয়ে থাকে।

৮০ দশক থেকে এখানে মূলত যৌনকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এই সময় থেকে এখানে যৌনকর্মীদের অনেক ছোটছোট ঘর গড়ে ওঠে। শান্তিপুরের সন্ধ্যে নামলেই যৌনপল্লীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্যস্ত রাস্তারধারে তাঁরা জমা হতে শুরু করে। চড়া মেকআপ, পোশাক-আশাক অন্য রকম, চোখেমুখে প্রগলভতা। চোখের ইশারা, হাতের ইঙ্গিত চলতে থাকে। চলতি পথে অনেকেই সেই ইশারায় থমকে এগিয়ে যান। বেশ কিছু গাড়ি, মোটরবাইক এসে থামে তাঁদের সামনে। এইভাবেই চলে খরিদ্দার সংগ্রহ। এই যৌনকর্মীরা আবার শান্তিপুর শহরের একাধিক প্রান্তে এবং স্টেশন চত্বরে অস্থায়ী যৌনকর্মী হিসাবে খরিদ্দার সংগ্রহ করে থাকে। যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির শাখা (DMSC) রয়েছে নদিয়াতেও। সেখানে তাদের সংগঠনের দায়িত্বে থাকা বিকাশ বণিকের কাছ থেকে জানা যায় যে, শান্তিপুর ছাড়া নদীয়ার কোথাও আলাদা করে স্থায়ী যৌনপল্লী নেই। শান্তিপুরের অনেক যৌনকর্মীরা কৃষ্ণনগরের মতো শহরের ভিতর ব্যস্ত এলাকা, রাস্তা, বাজারের ধারে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়ায়। এঁরা সংগঠনের মধ্যে আসতে চায় না। ফলে এঁদের মধ্যে সচেতনতা অভিযানও চালানো যায় না তাঁর কথায়, "শহরে আলাদা যৌনপল্লী না-থাকলে এই সমস্যা থাকবেই। প্রশাসনের উচিত

ব্যবস্থা নেওয়া।" নাগরিকদের একাংশের দাবি, প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যৌনকর্মীদের চোখের ইশারা বা শরীরী বিভঙ্গের মাধ্যমে খদ্দের ডাকা বা 'সলিসিটিং' নিষিদ্ধ। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না। নদিয়ার পুলিশ সুপার রূপেশ কুমার অবশ্য বলেন, "ইতিমধ্যে জেলার একাধিক আইসি এবং ওসি-র সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।" শান্তিপুরের যৌনকর্মীরা গঙ্গার ঘাটের কাছেও খরিদ্দার সংগ্রহের জন্যও অপেক্ষে করে। এছাড়া শান্তিপুরের যৌনকর্মীরা কৃষ্ণনগরের শহরে প্রবেশের আগে থেকেই ৩৪ নং জাতীয় সড়কের গাঁ ঘেঁষে গড়ে উঠেছে একাধিক হোটেল সেখানেও তারা কাজ করেন, এক্ষেত্রে তাদের হোটেল মালিকের সাথে চুক্তি থাকে। এখানে যোগাযোগ ঘটে তাদের দালালদের সূত্রে। দুপুর থেকেই অধিকাংশ হোটেলে রমরমিয়ে চলে এই যৌনকর্মীদের খরিদ্দার সংগ্রহ। হোটেল গুলির আশেপাশে অবস্থিত দোকানগুলির দোকানদারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে চাকদহ, রানাঘাট, হাটি, হালিশহর, হুগলির ত্রিবেণী, ব্যান্ডেলের মতো এলাকা থেকে অনেক মেয়ে এখানে এসে এখানে কাজ করছে, এছাড়া ভালুকা, কুলে, বেলেডাঙ্গা, বড়োজিয়াকুর ফকিরডাঙ্গার মতো প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরা এখানে এসে ঘরভাড়া নিয়ে কাজ করছে। এই সব মেয়েদের এখানে কাজে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দালালদের ভুমিকা অপরিহার্য। এছাড়া শান্তিপুরের যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অনেকেই আবার কৃষ্ণনগর স্টেশনের পাশে যায় কাজের সন্ধানে আবার অনেককে দেখা যায় কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডেও।

খ. বাহাদুরপুর:

বাস থেকে নেমে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে একটু হাঁটলেই কাঁচা পাকা বেশকিছু টিনের ঘরের দেখা মিলবে। পুরো গ্রামের অপরপ্রান্তে ঘরগুলো বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। গ্রামটির প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই দেখা যাবে ময়লার ভাগাড়, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে কন্ডোমের

মোড়ক, পচা কাপড় চোপড়, প্লাস্টিকসহ মাদক গ্রহণের পাত্র দিয়ে ছোট ডোবা ভরে এই ভাগাড় তৈরি হয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে একটু হাঁটলেই দেখা মিলবে অলিতে গলিতে যৌনকর্মীদের হৈ-হুল্লোড়। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে বাহাদুরপুরে রাস্তার ধারে রয়েছে বহু হোটেল। সন্ধ্যা হতেই শান্তিপুর, হাঁসখালি থেকে মহিলারা চলে আসে হোটেলগুলিতে। জাতীয় সড়ক দিয়ে মোটরবাইক যেতে দেখলেই হোটেলগুলি থেকে টর্চের আলো ফেলে সঙ্কেত দেওয়া হয় খদ্দের ধরার জন্য । খদ্দের ধরার জন্য দৈনিক অল্পটাকার বিনিময়ে লোক নিয়োগ করে থাকে হোটেল মালিকেরা। আসলে বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীটি অস্থায়ীযৌনপল্লী হিসাবেই পরিচিত। গোবিন্দপুরের বাসিন্দা দেবেশ দাস (ছদ্মনাম) বলেন, "একবার নবদ্বীপ থেকে গাড়ী নিয়ে ফেরার পথে গাড়ী থামিয়ে একটি হোটেলে খেতে গেলে হোটেলের এক কর্মী এসে জিজ্ঞাসা করতে থাকে ঘর লাগবে কিনা। লাগবে না জানালে তিনি জানান, যৌনকর্মীও পাওয়া যাবে। তাঁদের নিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যবে।"[১৩]

শান্তিপুরের মতোই বাহাদুরপুরের ও গড়ে উঠেছে যৌনপল্লী তবে এই যৌনপল্লীটির শুরুর ইতিহাস সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে এখানে বেশিরভাগ যৌনকর্মী পথযৌনকর্মী হিসাবে কাজ করে থাকে। এখানে পুলিশদের রেটটা অনেক বেশী। রাস্তা থেকে খরিদ্দার সংগ্রহ করতে বাধা দেয়। যখন খরিদ্দাররা আসে ট্রেকার ও বাসে এবং যৌনপল্লীতে ঢুকতে গেলে চলে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ। অন্য জায়গা থেকে এখানে মেয়েরা কাজ করতে এলে তার জন্য পুলিশদের কিছু টাকা দিতে হয়। আসলে বাহাদুরপুর যৌনপল্লীর কর্মীরা পাশের হোটেলগুলিতেই যৌকর্মীহিসাবে

[১৩] তথ্য প্রদাতার নাম, দেবেশ দাস (ছদ্মনাম), ট্রাক ড্রাইভার, বয়স৩০, ঠিকানা গোবিন্দপুর, সংগ্রহের তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

কাজ করে থাকে। শান্তিপুরের যৌনপল্লীর অনেক যৌকর্মীরাও এখানে এসে কাজ করে থাকে। আবার শান্তিপুরের রাসের সময় এখান থেকে অনেক যৌনকর্মী শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে গিয়ে ঘড়ভাড়া নিয়ে কাজ করে থাকে। বাহাদুরপুরে স্থায়ীভাবে যে যৌনকর্মীরা রয়েছে তাঁদের কাছে বাহাদুরপুরের আশে পাশের গ্রামের বিধবামেয়ে এবং সাধারন মেয়েরাও ঘরভাড়া নিয়ে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করেতে চলে আসে। বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীতে অনেক মেয়ে আসে, থাকে, আবার চলে যায়। যে যৌনকর্মীরা বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীতে অনেকদিন ধরে বসবাস করছে তাঁরা এখানেই থাকে। খরিদ্দারের সংখ্যা যখন খুব বেশি থাকে না তখন আয় তাঁদের একদম কমে যায় তখন তাঁরা যে হোটেলগুলিতে কাজ করতো সেই হোটেল মালিকের কাছ থেকেও টাকা ধার করে থাকে। নতুন কোন মেয়ে নিয়ে আসলে বা পল্লীর কোন যৌনকর্মীর অধীনে স্থায়ী ভাবে থাকতে গেলে এফিডেভিটও করতে হয়। বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীতে আগের দিকে মস্তানদের প্রভাব বেশ ছিল এখন একটু কম। এছাড়া এখানে গণ্ডোগোল, অশান্তি, খুন, জখম লেগেয় আছে। যৌকর্মীদের নিজেরদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিশেষ করে যৌনপল্লীতে কোন যৌনকর্মী খুন হলে যৌনপল্লীর ঘর গুলি বেশ কিছুদিন করে বন্ধ থাকে, পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার যৌনকর্মীদের কাজকর্ম শুরু হয়। যৌনপল্লী বন্ধথাকা অবস্থাতে এখানকার যৌনকর্মীরা ভাসমান যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করে থাকে। যৌনপল্লী ও পাশের হোটেল গুলিতে যৌনকর্মীদের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে যে বিষয় গুলি কাজ করে তা হল – রাজনৈতিক ইস্যু, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। বাহাদুরপুরের যৌনকর্মীরা বাড়িতেও ফিরে যেতে পারে না কেননা জীবন চালানোর জন্য অর্থের দরকার হয়, পরিবারেও ফিরে যেতে পারে না সমাজের মানুষও তাদেরকে অন্য চোখে দেখে, খুব সহজে অন্য কোন কাজও তাঁরা পায় না জীবন ধারনের জন্য কেননা জীবনের অনেকটা সময় এই যৌনপেশাতে কাজ করে অভ্যস্ত তাই

একজন কর্মী আর অন্য পেশাতে আসতে পারে না। এছাড়া সন্তান, পরিবারের লোকদের চালানোর জন্যও তাকে কাজ করতে হয়। যখন সে যৌনপল্লীতে ছিল তখন তাঁর থাকার জায়গা ছিল, জীবন চালানোর জন্য রোজগারের ব্যবস্থা ছিল যখন সেই জায়গা হারিয়ে যায় তখন সে ভাসমান। বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীর স্থায়ীত্ব দেওয়া নিয়ে নানা আলোচনা হলেও সেটা স্থায়ীত্ব লাভ করে নি। মূলত বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীটীর ক্ষেত্রে ঝামেলা বা গন্ডোলের মতো বিষয় কে কেন্দ্র করে বন্ধকরে দেওয়ার মধ্যদিয়ে আসলে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এলাকা দখলের চেষ্টা চলে। এখানে রাজনৈতিক প্রভাবটাই বেশী প্রবল। বাহাদুরপুর রাস্তা বা রাস্তার ধারে হোটেল সংলগ্ন এলাকাতে যেখানে যৌনকর্মীরা খরিদ্দার সংগ্রহের জন্য দাঁড়াচ্ছে সেখানে খদ্দের হিসাবে অনেক সমাজবিরোধীরা, মাদক পাচারকারি মানুষরাও আসছে। তাদের জন্য অপরাধমূলক ঘটনা বাড়ছে। এই সব বিষয় নিয়ে যৌনকর্মীদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

গ. মুর্শিদাবাদ:

মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা বিভাগের একটি জেলা। জেলার মধ্যদিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। নবাবী আমলে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। নবাবী আমলের রাজ রাজারা আজ আর নেই তবে রয়ে গেছে তাঁদের তৈরি প্রাসাদ, স্থাপত্যশৈলী। যা এখন ঐতিহাহিস পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই নবাবী আমলের নিদর্শনকে দেখতে দেশ বিদেশ, ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে বিভিন্ন মানুষ। আর এই মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি পাশে ভাগীরথীর পাড়ে গড়ে উঠেছে যৌনপল্লী। যা অস্থায়ী যৌনপল্লী হিসাবেই পরিচিত। বছরের বিশেষ সময়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে আর সেই সময় চলে যৌনকর্মীদের খরিদ্দার সংগ্রহের

পালা। হাজারদুয়ারির পাশে ভাগীরথীর পাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যৌনকর্মীদের ঘর।

মুর্শিদাবাদের যৌনপল্লীর কথা বলতে গিয়ে সাধারনভাবেই যৌনপর্যটনের বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সেক্স ট্যুরিজম বা যৌনপর্যটন হলো অর্থের বিনিময়ে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ স্থানে ভ্রমণ করা। জাতিসংঘের বিশেষ অ্যাজেন্সি বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, পর্যটনখাত কর্তৃক আয়োজিত অথবা এই খাতের বাইরের কারোর আয়োজনে পর্যটন খাতের কাঠামো ও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে গন্তব্যস্থানের বসবাসস্থলে পর্যটক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকেই সেক্স ট্যুরিজম বা যৌনপর্যটন বলে। বলা হয়, যৌনতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিনোদনমূলক স্থাপনা এবং যৌনপর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মালিক, ব্যবস্থাপক, দালাল, সহযোগী, ক্যাশিয়ার, নিরাপত্তারক্ষী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে আরো কয়েক মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনধারণ করে থাকে। তবে এই যৌনপল্লীটি কিন্তু সেক্স ট্যুরিজমের সংজ্ঞার সাথে মেলানো যায় না। আসলে এখানে বিভিন্ন প্রান্তর থেকে মানুষরা আসে নবাবী আমলের নিদর্শন দেখার জন্য, তাই সারা বছর ধরেই এখানে মানুষের আসা যাওয়া চলতেই থাকে আর হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে থাকে। তবে এখানে যৌপল্লী গড়ে ওঠার মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। নবাবী আমলের সময় থেকেই চলতো নবাবদের জন্য মেয়ে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। শোনা যায় যে লালবাগের সুড়ঙ্গ পথে দিল্লী থেকে নবাব ও রাজরাজাদের বিলাসের জন্য মেয়ে নিয়ে আসা হত। রাজদরবারে বাইজী, নর্তকী, ও রক্ষিতাদের একটা পরিধি ছিল। ইংরেজদের ক্ষমতা লাভ, রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত হয়

কলকাতাতে। তার ফলে অনেক বৃত্তশালী অভিজাতবর্গ মুর্শিদাবাদের বাস উঠীয়ে চলে আসে কলকাতাতে। তাদের পিছু পিছু আসে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ঠ বহু নট-নটী, বাইজী, নর্তকী ও গনিকা।[১৪] আর নবাবী পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ঠ কিছু মেয়ে থেকে যায় এখানেই। ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে আসার ফলে এই মেয়েরা ব্রিটিশদেরও যৌন চাদিদা মেটাতো। তখন থেকেই যৌনব্যবসা শুরু হতে থাকে। কাশিমবাজার ছিল ব্রিটিশদের বানিজ্যের মূল কেন্দ্র। এখানে নবাবী আমলের অনেক মেয়েই বসবাস স্থাপন করে থাকে।[১৫] এখানে তখন থেকেই যৌনকর্মীদের পাওয়া যেত। বিভিন্ন সমুদ্রগামী নাবিক, ব্যবসায়ী ও বৃটিশদের যৌন চাহিদার তাগিদ থেকেই যৌনপল্লী গড়ে উঠতে থাকে। দেশের স্বাধীনতালাভ ইংরেজদের দেশত্যাগ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক দর্শনীয়স্থানে পরিনত হয়। কাশিমবাজার থেকে অনেকে যৌনকর্মী জীবন জীবিকার সন্ধ্যানে চলে আসে হাজারদুয়ারি সংলগ্ন ভাগীরথীর পাড়ে নির্জন এলাকাতে। গড়ে ওঠে বিচ্ছন্ন ভাবে ছোট ছোট যৌকর্মীদের ঘর। সারা বছর ধরেই চলতে থাকে কমবেশি পর্যটকদের আনাগোনা আর এখান থেকেই দালালদের মাধ্যমে চলেতে থাকে যৌনকর্মীদের খরিদ্দার সংগ্রহ। বর্তমানে হাজারদুয়ারির সংলগ্ন যৌনপল্লীটি আঞ্চলিক রুপ লাভ করেছে। কারন এখানে মুর্শিদাবাদের আশেপাশের অঞ্চল যেমন লালগোলা, ভগবানগোলা, বেলডাঙ্গা হরিহরপাড়া, নবগ্রামের মতো দরিদ্র পরিবারের অনেক মেয়ে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করছে। মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান হওয়ার জন্য এখানে গড়ে উঠেছে একাধিক ছোট বড়ো হোটেল। হোটেল গুলিতেও পাওয়া যায় যৌনকর্মীদের দেখা।

---

[১৪] সুমনা দাস দত্ত, ঠাকুর বাড়ির ব্যবসা, আত্মজা পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৩৯।

[১৫] সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, চেনা মুর্শিদাবাদঃ অচেনা ইতিবৃত্ত, অমৃতা প্রকাশনী, ১৯৯৬।

হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা হোটেল গুলিতেও কাজকরে থাকে। এক্ষেত্রে যৌনকর্মীরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে দেওয়া দালাল হোটেলমালিকের সাথে থাকে চুক্তি। হাজাদুয়ারির সংলগ্ন যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরাও পথযৌনকর্মী হয়েও কাজ করে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে।

জেলা জুড়ে রয়েছে প্রায় ১৪০ কিমি জাতীয় সড়ক এই দীর্ঘ সড়কের পথের বিভিন্ন প্রান্তে রাতে যৌনকর্মীরা নেমে পড়ে খরিদ্দার সংগ্রহের জন্য। লক্ষ্য বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভার ও লরি চালকরা। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরেই ফারাক্কা ও ডোমকলে দুটি যৌনপল্লী রয়েছে। এছাড়াও লুকিয়ে চুরিয়ে জাতীয় সড়ক বরাবর বাইরে থেকে আসা মহিলাদের রমরমা ঘিরে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকরাও। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে – ফারাক্কা, আহিরন, ধুলিয়ান, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, ডোমকল, ও বহরমপুরেও চলছে যৌনকর্মীদের রমরমা যৌনব্যবসা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জেলাকেন্দ্রিক যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের কাজ
ও যৌনকর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির পাশে ভাগীরথীর পাড়ে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবন যাপন বেশ বিচিত্র, জীবনের অনেক যন্ত্রনা, কষ্টের মধ্যেও তারা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় এটাই যেন তাদের জীবনের সাথে লড়াই। খরিদ্দার সংগ্রহের জন্য সন্ধ্যা নামার আগে থেকেই চলতে থাকে তাদের চড়া সাজগোজ, হাসি, তামাশা, খুনসুটি চলতে থাকে হরদম। আবার অশালীন, অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তিও (গালমন্দ) কাটছে কেউ কেউ। কানে ভেসে আসছে থাকে রাতে খদ্দেরদের বিষয়ে নানা কথাও। কোন বাবু কত বকশিস দিল, কোন বাবুর স্ত্রী কেমন-এমনই আলাপে ওরা একেবারে জমিয়ে তুলছে নিজেদেরকে। যৌনপল্লীর গাঁ ঘেষে গড়ে উঠেছে খাবারের হোটেল। দেশী মদের দোকানগুলি খুপড়ি ঘরগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে যেসব শয্যাসঙ্গী পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে কারো জন্ম এই পাড়াতে আবার কেউ কেউ পাচার হয়ে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

তেমনি একজন যৌনকর্মী তিথী (ছদ্ম নাম), বয়স ২৪, যাকে নদীয়া জেলার ভালুকা গ্রাম থেকে কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে এক প্রতিবেশি। তার পর থেকে এই যৌনপল্লীতেই তার স্থান, পরিবারের অর্থনৈতিক অভাব, সংসারে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার মতো অভাব। তাই পাশের প্রতিবেশির হাত ধরে বেড়িয়ে পড়েছিল নতুন জীবনের আশায়। সেই কাছের মানুষটিও প্রতারণা করে চলে যায়। তখন তিথি একা হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচেতো তাকে থাকতেই হবে, বাড়ী থেকে যেহেতু বেড়িয়ে এসেছিল কাউকে কিছু না বলে তাই বাড়িতে ফিরতে পারবে না। নিজের চেষ্টায় শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় তৈরির কাজ শিখে কাজ ও করে বেশ কিছু দিন,

সেখান থেকে যে অর্থউপার্জন হয় তা খুব সামান্য যা দিয়ে জীবনচলা খুবই কষ্টকর। সারা সপ্তাহ ধরে কাপড় তৈরি করে মাত্র ৪০০/৫০০ টাকা উপার্জন করা যায়। এর পরই তার সাথে পরিচয় ঘটে ওখানকার কিছু মেয়ের সাথে যারা শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে অস্থায়ী ভাবে ঘড় ভাড়া নিয়ে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করে থাকে। তিথির সাথে তাঁদের মেলামেশাতে জানতে পারে তিথির শোক দুঃখের কথা। সেই তাঁতি পাড়ার মেয়ে দুটি তাদের কাজের কথা তিথিকে জানায়, শেষে তিথি ও চলে আসে তাদের সাথে শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে। এখানে সে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করে এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বচ্ছলতা লাভ করে। গ্রামের বাড়িতেও পরিবারের জন্য টাকা পাঠাতে পারে। তিথি আর ফিরে যায় নি পরিবারে। সে এখন যৌনকর্মী হয়েই রয়ে গেছে শান্তিপুরে যৌনপল্লীতে।[১৬]

পূর্ণিদাসের (ছদ্মনাম) বাড়ি শান্তিপুর থানার বড়োজিয়াকুরের বাসডোম গ্রামে। ছোট বেলায় বাবা মারা যায় সেই থেকেই মা উন্মাদের মতো হয়ে যায়, বাঁশের চাটা দিয়ে তৈরি জীর্ণ ঘর কোন রকমে টিকে রয়েছে, খাওয়া দাওয়া চলবে কি করে, তারও কাজের খোজ শুরু হয়। কিন্তু পূর্ণি কোথায় পাবে কাজ। শেষে পাশের প্রতিবেশী কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে। তারপর থেকেই পূর্ণি শান্তিপুরের যৌনপল্লীর একজন যৌনকর্মী হয়ে ওঠে। তার ভাষায়, "পাড়াপড়শি তো তাই তার কথায় এসেছি। শুনছি এখানে আনার পর সর্দারনীর হাতে তুলে দিয়েছিল আমাকে, তার কাছে ৩০ হাজার টাকায় বেচে দিয়েছে শুনেছি। যতদিন ওই টাকা শোধ না হবে ততদিন এখানেই থাকতে হবে। প্রথম দিকে খুবই কষ্ট হতো, মনে হতো

[১৬] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- তিথি সাহা, বয়স ২৪, ঠিকানা- ভালুকা গ্রাম, বর্তমান বাসস্থান- শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৬.২.২০১৯

আত্মহত্যা করি। এখন অবশ্য সহ্য হচ্ছে।”[১৭] এভাবেই পূর্ণি দাস তার স্বাভাবিক জীবন থেকে যৌনকর্মী হয়ে ওঠার গল্প বলে।

জেলার যৌনপল্লীগুলিতে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে খদ্দেরের সংখ্যাও। তাই তো এখানকার যৌনকর্মীদের ব্যস্ততা বাড়ে। সন্ধ্যা বেলায় ওরা উদাসীন নয়, তারা প্রত্যেকেই তাদের রূপের প্রকাশ ঘটায়। মেকআপ থাকে মুখজুড়ে। বসনের সঙ্গে মিলিয়ে লিপস্টিক। লিপস্টিকের রঙের সাথে মিলিয়ে কপালে ছোট-বড় টিপ। কড়া পারফিউম, বাহারি দুল শোভা পাচ্ছে কানের লতিতে। কারও কারও কানে একাধিক রিং। মনের মাধুরী মিশিয়ে চুল বেণি করতে যে বেশ সময় নিয়েছে ওরা, তা গাঁথুনি দেখেই ঠাওর করা যায়। বেশি বয়সীদের বেশিরভাগই খোপা বাঁধা। নূপুরের নিক্কন ধ্বনি কারও কারও হাঁটার তালে। শুধু যে নিজেদের সাজিয়ে রাখে তা নয়, ঘরটিও বাহারি ধরনের কাগজে সাজায় তারা। কাস্টমারদের খুশির জন্য বাহারি কাগজ ও নানা রকমের ছবি দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে রাখে। এইসব যৌনপল্লীর অধিকাংশ কাস্টমার হলো ট্রাক চালকরা, আশে পাশের গ্রামের মানুষ, গঙ্গার ঘাটের মাঝিমল্লা, এছাড়াও রয়েছে বাইরের মানুষ। এছাড়া বিশেষ করে বাইরে থেকে শান্তিপুরে তাঁতের কাপড় কিনতে আসা বিভিন্ন ব্যবসাদাররাও এখানকার খরিদ্দার। এখানে খুব সস্তায় যৌনকর্মী ভাড়া পাওয়া যায়, যৌনপল্লীতে আসা একজন যুবক দেবেশ দাসের (ছদ্মনাম) থেকে জানা যায় যে “শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে ২০ বছর থেকে শুরু করে ৩০/৪০ বছরের মায়েরা এখানে আছে; তাদের পেতে ২০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকাও গুনতে হয়।” যৌনপল্লীর মাঝখানে চলে জুয়া খেলার উন্মাদনা

[১৭] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- পূর্ণি দাস, বয়স ২২, ঠিকানা- বড়োজিয়াকুরের বাসডোম গ্রাম, বর্তমান বাসস্থান-শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৭.২.২০১৯

হাঁক ছাড়ছে জুয়াড়িরা। সেই সাথে মাদক বিক্রিও হয় এখানে। এর আশপাশ ঘিরেই কয়েকটি ডিসকো ঘর। তাতে একাধিক বিছানা পাতা। বাবুদের আয়েশের জন্য আছে কোলবালিশও। সেখানে মদ মিলছে, মিলছে মেয়েদের নাচও। খদ্দেরের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা থাকলেই কেবল এমন নাচ দেখায় ওরা। ১০ ও ১২ বছর বয়সী পাপাই, বিশু তাদের মা শেফালিও (ছদ্মনাম) এই শান্তিপুরের যৌনপল্লীর যৌনকর্মী, আর বাবা শেফালির খদ্দের ছিলো। যাতায়াত করতে করতে এক সময় তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়; পরে বিয়ে। শেফালির সংসারে এখন ছয় সন্তান, তাদের মধ্যে ৩ মেয়েই যৌনকর্মী। শেফালির ভাষায়, 'তিন মেয়ের ধান্ধাতেই (যৌনকর্ম) সংসার চলে।'[১৮] শেফালীর বড় মেয়ে খুশি, সে-ও একজন যৌনকর্মী। ছোট ভাই বোনদের সামনে এই কাজ করতে খারাপ লাগে না খুশির, তার ভাইরাও কিছু মনে করে না, ওরা ছোটবেলা থেকেই দেখে অভ্যস্ত। মাকেও দেখেছে এই কাজ করতে। খারাপ লাগলেও করার কিছু নেই। কারণ, সংসার চলে খুশির টাকায়।[১৯]

কৃষ্ণনগরের চাপড়াগ্রাম থেকে ভালোবাসার মানুষেরদ্বারা প্রতারিত হয়ে এসে রিতার (ছদ্মনাম) ঠাঁই হয় শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে। বয়স এখন তার পঞ্চাশের ঘরে পা রেখেছে। মেয়ে পিংকিকে (১৯) বাসে তুলে দিয়ে চায়ের দোকানে এসে বসেছে। পরিচয় দিয়ে আলাপ তুলতেই বলে, "যৌনকর্মীদের কথা শুনে কী হবে, গল্প করলে তো পেটের ভাত হবে না। দিনে দিনে খদ্দের খালি কমছে। বলেন আমরা আর আগের মতো ভালো নেই। মানুষ ভালো থাকলেই তো আমরা

---

[১৮] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম-শেফালি মাহাতো, বয়স ২৫, ঠিকানা- বড়োবাজার, শান্তিপুর যৌনপল্লী, বর্তমান বাসস্থান- শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৪.২.২০১৯

[১৯] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম-খুসি মাহাতো, বয়স ২৫, ঠিকানা- বড়োবাজার, শান্তিপুর যৌনপল্লী, বর্তমান বাসস্থান- শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৪.২.২০১৯

ভালো থাকি। দেশের অবস্থা তো আমরাও কিছুটা বুঝতে পারি। বাজারে গেলেই মানুষের পকেট খালি হয়ে যায়। এখানে ফূর্তি করতে আসতে তো টাকা লাগে। দিনভর অপেক্ষা করেও দুজন বাবু মেলাতে পারি না। যারা আসেন তারা আর আগের মতো বকশিশও দেয় না। খরিদ্দারের সংখ্যা যখন কম থাকে তখন পথযৌনকর্মী হিসাবেও কাজ খুজে নিতে হয়।" বাহাদুরপুরে যৌনপল্লীর পাশে ৩৪নং জাতীয় সড়কের গাঁ-ঘেষে গড়ে ওঠা হোটেলগুলিতেও গিয়ে বছরের বিভিন্ন সময় যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে হয় রীতা কে।[২০]

যৌনপল্লী রাজ্যের প্রায় সব জেলায় কমবেশি বিস্তৃতি লাভ করছে। যৌনপল্লীর যৌনকর্মীর পেশায় যারা সরাসরি সম্পৃক্তভাবে জড়িত যে সব নারী তাদের অধিকাংশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঘৃনিত ও বঞ্চিত। যে সকল মেয়েরা যৌনকর্মী আছে তাদের প্রায় সকলেই কোননা কোন ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই নির্যাতনে স্বীকার। শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, এবং মুর্শিদাবাদের মতো যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীরা যৌনপেশার সাথে জড়িয়ে আছে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা সামাজিকতা রাখতে গিয়ে তাদের আয় ব্যয়ের অসংগতি দূর করতে যৌনপেশাতে জড়িয়ে যায়। শান্তিপুরের মতোই বাহাদুরপুরেরও গড়ে উঠেছে যৌনপল্লী, এখানে যৌনকর্মীদের জীবন শান্তিপুরের যৌনকর্মীদের থেকেও কঠিন কেননা বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীটি শান্তিপুরের যৌনপল্লীর মতো স্থায়ী যৌনপল্লী নয়।

---

[২০] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- রীতা কর্মকার, বয়স ৫২, ঠিকানা- কৃষ্ণনগর থানার চাপড়া গ্রাম, বর্তমান বাসস্থান-শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩.২.২০১৯

যৌনপল্লীর মধ্যে যৌনকর্মীদের ক্ষমতার স্তর বিন্যাস

যৌনপল্লীর ভিতরে যৌনকর্মীদের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন স্তর। যৌনকর্মীদের জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপ পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে। যৌনপল্লী গুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে একাধিক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, বয়স্ক যৌনকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে যৌনপল্লীতে কাজ করতে করতে হয়ে ওঠে মাসি তথা র্সদারনীর।[২১] সর্দারনীর নতুন পেশাতে প্রবেশ করা যৌনকর্মী বিশেষতঅল্প বয়সী কর্মীর কর্ত্রী কিংবা অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। সর্দারনীর অধীনে থাকা যৌনকর্মী কিছু নিয়মাবলীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তখন এই নতুন যৌনকর্মীরা র্সদারনীর অধীনস্থ যৌনকর্মী হিসাবেই কাজ করে থাকে। সর্দারনীর অধীনে থাকা যৌনকর্মীর বয়স হয়ে যাবার পর যথেষ্ট পরিমানে অর্থ এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকলে তাদের প্রভাবে প্রাক্তন যৌনকর্মীরা সর্দারনীর পদ ধারন করেন। মূলত মেয়েটি থাকা খাওয়া ভোরন পোষন ঘর ভাড়া সব কিছুই বহন করেন র্সদারনীর। মেয়েটির সকল আয় চলে যায় র্সদারনীর কাছে। সর্দারনীর প্রচেষ্টাই থাকে তাকে কিভাবে একজন পরিপূর্ণ যৌনকর্মী বানানো যায়। যৌনপল্লীর নিজস্ব কিছু প্রচলিত প্রথা আছে। যৌনপল্লীতে নতুন কাজ করতে আসা মেয়েদেরকে সেই প্রথা বা নিয়ম মেনে চলতে হয় যৌনপল্লীর মধ্যে। যৌনপল্লী থেকে বাইরে যাতায়াত ও খদ্দেরের সাথে রুমে সময় কাটানো পছন্দমত সাজগোজ এবং পোষাক পরার ভঙ্গি থেকে শুরু করে, এমনকি বাথরুম যাবার সময় পর্যন্ত সবকিছু উপর সর্দারনীর কড়া নজরদাড়ী থাকে। অনিয়ম ঘটলে মেয়েটির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলে।

---

[২১] বয়স্ক যৌনকর্মী, অনেক দিন বা অনেক বছর ধরে যৌপল্লীতে কর্মরত প্রভাবশালী যৌনকর্মী, যার অধীনে যৌনপল্লীতে আসা নতুন মেইয়েরা কাজ করে থাকে, এবং নতুন যৌনকর্মীদের কাছ থেকে মাসোহারাস নিয়ে থাকেন, যৌনপল্লীর ভাষায় তাকেই সর্দারনীর বা মালকিন বা মাসি বলা হয়।

কখনও পালানোর চেষ্টা করলে পেতে হয় প্রচণ্ড শাস্তি। একজন যৌনকর্মীকে সর্দারনীর অধীন থেকে মুক্তি হতে হলে তাকে র্সদারনী পাওনা টাকা পরিশোধ করতে হয়। যৌনপল্লীতে কাজ করতে আসা নতুন যৌনকর্মীটি যদি পুলিশ, স্থানীয় পাড়ার মাস্তান বা প্রভাবশালীদের সাথে পরিচিতি ও সখ্যতা করতে পারে তাহলে তাদের সাহায্যে মেয়েটি সর্দারনীর অধীন থেকে মুক্তি পেতে পারে। আবার অনেক সময় সর্দারনীর টাকা পরিষোধ হয়ে গেলে, এছাড়াও যখন কোন যৌনকর্মী আর বেশী খদ্দের টানতে পারছে না অথবা তার আয় কমে গেছে তখন সর্দারনী নিজেই তাকে স্বাধীন করে দেয়। যৌনকর্মীটি তখন নিজের ইচ্ছাতে খরিদ্দার সংগ্রহ করতে পারে। এই সময় তার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকারী হিসাবে দাদা/বাবু, পুলিশ, মাস্তান ও দালালদের একটা প্রভাব থাকে। যৌনপল্লীর ভাষায় এই স্বাধীন যৌনকর্মীদের বলা হয় বকরী। কিছুদিন স্বাধীন ভাবে যৌনকাজ করে কিছু টাকা সঞ্চয় করে বাবু, মস্তান, এবং দালালদের সহযোগিতায় নিয়ে যৌনকর্মীরটি একসময় ঘরওয়ালী হতে উঠতে পারে। সাধারনত যৌনকর্মীরা তখন তাকে ডাকে বড় আপা, মাসি এবং দিদি বলে। তখন তার অধীনে বেশ কয়েকজন যৌনকর্মী কাজ করে। এই সময় সে অন্য যৌনকর্মীর কাছে ঘর ভাড়া দিতে পাড়ে। যৌনপল্লীতে প্রচলিত নিয়ম পালনে সহযোগিতা করে থাকে দাদাল, ঘরওয়ালী ও সর্দারনীররা। দালালরা পাচারকারীর সহযোগিতায় যৌন ব্যবসার জন্য কিনে আনে অল্প বয়সী কিছু মেয়ে। যাদেরকে ডাকা হয় ছুকরী নামে। মেয়েরা সর্দারনীর তার কাছে থাকে ‘বন্ধকী’ হিসেবে। কেনার টাকা সর্দারনী যৌনকর্মীর কাছ থেকে কয়েক বছর ধরে আদায় করেন। একেকজন যৌনকর্মীর ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ টাকা তিনি কেটে রাখেন অবস্থাভেদে। খদ্দের নিয়ে আসা দালালের টাকাও কখনো কর্মীকে পরিশোধ করতে হয়। মাঝে মাঝে কর্মীর বয়স বেশি কম হলে পুরো টাকাই চলে যায় সর্দারনীর হাতে। বিনিময়ে মেয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে শুধু তিনবেলা খাবার আর কিছু উপহার।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যৌনপল্লীর যোগাযোগ দালাল আর সর্দারনীর মাধ্যমে হয়। যৌনকর্মীদের পদমর্যাদায় সবচেয়ে ছোট পদের নাম হলো ছুকরি। ছুকরি, সর্দারনী/মাসীর অধীনে থাকা নবীন ও ঋণগ্রস্ত যৌনকর্মী। ছুকরির[২২] কাজের কোন স্বাধীনতা থাকেনা এবং নিজের আয়ের ওপর তার দাবী থাকে সামান্যই। সর্দারনী চুক্তিভেদে তার আয়ের সিংহভাগ নিজে নিয়ে নেন এবং মাঝে মাঝে বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে দালালের পাওনা তাকেই মেটাতে হয়। তারা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে থাকে, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে দালাল কিংবা পুলিশ ধরে এনে আবার সর্দারনীর কাছেই নিয়ে আসা হয়। খদ্দের নির্বাচন ও সেবা দেবার ব্যাপারে তার কোন স্বাধীনতা নেই। কোন কারণে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে কিংবা অক্ষম হলে তাদের ওপর চলে নির্যাতন, অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঋণের আসল পরিমান থেকে অনেক গুণ বেশি টাকা শোধ করতে হয়, হিসাব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে।

ক্ষমতা এবং স্বার্থের লড়াইয়ে টিকে থাকতে গিয়ে সময়ের সাথে সাথে একসময় নিঃস্ব হয়ে পড়ে র্সদারনীরও। কমতে থাকে তার শক্তির দাপট। স্বার্থপর লোভী দালাল শ্রেনীর তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরতে থাকে। বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে পরে। আয় ব্যয়ের অসংঙ্গতি বাড়তে থাকে। একসময় বাধ্য হন অন্য সচল যৌনকর্মীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার করে কোন রকমের জীবন চালাতে। বৃদ্ধ যৌনকর্মী শারীরিক ভাবে কর্ম অক্ষম হয়ে পড়লে এই যৌনকর্মীকে সমাজ গ্রহন করতে চায়না। নিকট আত্বীয় স্বজনরা পরিচয় দিতে চান না। তার সর্বশেষ ঠিকানা ঐ যৌনপল্লী এবং সেখানে কাটিয়ে দেন বাকীটা জীবন। বেঁচে থাকার তাগিদে

---

[২২] যৌনকর্মীদের পদমর্যাদায় সবচেয়ে ছোট পদের নাম হলো ছুকরি। যৌনপল্লীতে নতুন কাজে আসা মেয়ে, যৌনপল্লীর ভাষায় যাকে ছুকরি বলে ডাকা হয়ে থাকে।

তখন অন্য যৌনকর্মীর বাসায় কাজ করতেও হয়। কোন ভাবে জীবন কেটে যায় বয়সের ভারে আস্তে আস্তে কর্মক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের আজীবনের সর্বশেষ দৃশ্যটা আরো করুন হয়ে ওঠে, কোন যৌনকর্মীর মৃত্যু হলে যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরাই সবাই মিলে টাকা দিয়ে মৃতযৌনকর্মীর দেহের সৎকার করে থাকে।

যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের কিছু উপসংস্কৃতি

যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের মধ্যে বেশকিছু উপসংস্কৃতিও রয়েছে।[২৩] শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, যৌনপল্লীতে নিজস্ব কিছু উপসংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে কোন বিপদ বা রোগ ব্যাধি দেখা দিলে যৌনকর্মীরা আয়োজন করে থাকে রাতব্যাপী জাগরী গীতি। গান বাজনা এবং কীর্তন করা হয়। চলে বিভিন্ন ধরনের খাওয়া দাওয়া। যৌনকর্মীদের কাছে পরপর দুই তিনদিন কোন খদ্দের যদি না আসে তাহলে তারা সোনা রুপার জল গরুর দুধের সাথে মিশিয়ে তার নিজের গায়ে জামা কাপড়ে সমস্ত ঘরে ছিটিয়ে তারপর সেই জল স্নানের সময় গায়ে দেয়। তাদের ধারনা তাতে তাদের খদ্দের আসা বৃদ্ধি পাবে। অধিক সংখ্যক খদ্দের নেয়ার জন্য তাঁরা কিছু প্রচলিত মন্ত্র জপে, কোমরে বাধে গাছের শিকড়। কি গাছের তা জানা যায় নি। রোজার মাসে মেয়েরা রোজা রাখে না। তাদের বিশ্বাস যৌন পল্লীতে রোজা হয়না।[২৪] রোজার মাসে অন্যকোন একজন গরীব মানুষকে খাইয়ে দেন।

---

[২৩] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- শেফালী মাহাতো, বয়স ৫৮, ঠিকানা- বড়োবাজার, শান্তিপুর, বর্তমান বাসস্থান-শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩.২.২০১৯

[২৪] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- হাসিনা মণ্ডল, বয়স ৫০, ঠিকানা- লালগোলা, বর্তমান বাসস্থান-মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২২.১.২০১৯

যৌনকর্মীদের সামাজিক সমস্যা ও নির্যাতন

যৌনকর্মীদেরকে কাজ ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়। পল্লীর অন্তর্গত সমস্যা, পল্লীর বাইরে সামাজিক হয়রানি। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার নিরলস পরিশ্রমের ফলে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা এতোই ক্ষুদ্র যে যৌনকর্মীরা তাদের পুরো জীবদ্দশায় শুধু সমস্যারই মোকাবালাই করেন, সমাধানের পথ খুঁজে পান না। জেলার যৌনপল্লীমধ্যেও রয়েছে পল্লীর অন্তর্গত সমস্যা। দালাল, সর্দারনীর শারীরিক মানসিক অত্যাচারের পাশাপাশি পল্লীতে রয়েছে আরো নানাবিধ সমস্যা। নতুন কাজ করতে আসা যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে পল্লীর বাইরে যাবার সুযোগ না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে পল্লীর ভেতর থেকেই বেশি দামে নিম্নমানের জিনিস কিনতে বাধ্য হয় তারা। পুলিশ ও স্থানীয় মাস্তানরা নানাভাবে হেনস্তা করে তাদের। বিনামূল্যে যৌনসেবা গ্রহনের পাশাপাশি তাদের সামাজিক এক্সপোজার ও মিথ্যা মামলার ভয় দেখানো হয়, তারসাথে আছে শারিরীক নির্যাতন। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মস্তানরা বিনামূল্যে যৌনসেবা গ্রহন করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর কোন শাস্তি হয় না, বরং দোষ দেওয়া হয় যৌনকর্মীকে। ক্ষমতাবান ক্রেতা কিংবা কতৃপক্ষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অত্যাচার সহ যৌনকর্মীর মৃত্যুও সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

পল্লীর বাইরেও যৌনকর্মীদের সামাজিক হয়রানির সম্মুখিন হতে হয়। পরিবার নিয়মিত অর্থ গ্রহন করলেও তাদেরকে (যৌনকর্মীদের কে) পরিবারে গ্রহণে অসম্মতি জানায়। এবং যৌনকর্মী বিয়ে করলেও স্বামীর পরিবার তার প্রাক্তন পেশা সম্পর্কে জানার পর তাকে শারীরিক ও

মানসিক ভাবে নির্যাতন করে। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ডাক পড়ে না তাদের। যৌনকর্মীরা সাধারণ সমাজের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশে নিজেদের ঘর, পরিবার থাকলেও সেখানে গিয়ে তারা থাকতে পারে না কেননা সমাজে মানুষের কাছ থেকে শুনতে হয় নানারকম বাজে কথাবার্তা। এমন কি তার জন্য তার পরিবারের লোকজনকেও শুনতে হয় নানা ধরনের মন্তব্য। তাই পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করলেও পরিবারে আর যৌনকর্মীদের থাকা হয় না। টাকা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা।[২৫] সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প সম্পর্কে তারা অবগত থাকে না। অনেক সময় বড় প্রিমিয়ামের একাউন্ট খুলিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় বীমা কর্মীরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনকর্মীরা লগ্নিক্রিত টাকা এবং তাদের প্রাপ্য বীমার রিটার্ন কিছুই ফেরৎ পায় না।

রাজনৈতিক–ধর্মীয় বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় যৌনকর্মীদের। ধর্মীয় কোন কোন অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করতে পারে না। সামাজিক কোন অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন থেকেও তারা নিজেদেরকে সড়িয়ে রাখে। পূজা-পার্বনের সময় সেখানে সমাজের মানুষের সমাবেশ ঘটে যৌনকর্মীদের সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তারা সেখানে সাধারনত যোগদান করে না। যৌনকর্মীরা তারা তাদের পল্লীতেই অনুষ্ঠান করে থাকে। পল্লীতেই তাদের উৎসব, আনন্দ পালন করে থাকে। যৌনপল্লীর কর্মীদের কাছে পল্লীই তাদের ঘর। সেখানে তারা নিরাপদ বোধ করে। জেলার প্রেক্ষাপটে যৌনকর্মীরা বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে যেমন

[২৫] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- শেফালী মাহাতো, বয়স ৫৮, ঠিকানা- বড়োবাজার, শান্তিপুর, বর্তমান বাসস্থান-শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩.২.২০১৯

১) যৌনপল্লীতে যৌনকর্মী রূপে কাজ করে।

২) পথযৌনকর্মী হিসাবেও কাজ করে থাকে।

৩) আবাসিক হোটেলের যৌনকর্মীরূপে কাজ করে থাকে।

৪) বাসা ভাড়া করা আবাসিক যৌনকর্মীরূপে কাজ করে থাকে।

জেলার যৌনপল্লীগুলিতে নারীরা আসে নিতান্তই পেটের দায়ে, ভালো চাকরীর প্রলোভনে, প্রতারিত হয়ে, প্রেম বা বিয়ের মিথ্যে আশ্বাসে পুরুষ সঙ্গী কতৃর্ক প্রতারিত হয়ে, ব্ল্যাক মেইল হয়ে, সংসারের বাড়তি খরচ সামাল দেবার জন্য, নিজের বাড়তি হাতখরচ মেটানোর জন্য, প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা মানসিক হতাশার জন্য। জেলার যৌনপল্লীগুলিতে যে মেয়েরা আসে তারা গ্রামের সাধারন সহজ সরল কিশোরী, গ্রামের বিধবা মহিলারা, গার্মেন্টস কর্মী, শহরের রাস্তা ও উদ্যান ভিত্তিক মহিলা (বিশেষত কিশোরী) হকার, বাসা বাড়ীর কাজের কিছু মহিলা, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ঘরের গৃহবধূ। জেলার যৌনপল্লীগুলিতে যৌনকাজ করার জন্য যারাই যৌনকর্মীদের দ্বারস্থ হয় তারাই খদ্দের। তারা সাধারনত পুরুষ। নিদির্ষ্ট কোন পেশাজীবী নয় তারা। তারপরও যৌনজীবীদের মতানুসারে যারা সাধারনত বেশী পরিমানে খদ্দের হয় তারা হলো - রিক্সাঅলা, হকার, ট্রাক-বাস ড্রাইভার, কলেজ ছাত্র, ব্যবসাদার, মাদকাসক্ত ব্যাক্তি, শিল্প-সংস্কৃতিক/ মিডিয়া লাইনের লোকজন, স্থানীয় মাস্তান, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ইত্যাদি। শেষ দুই দল সাধারনত, বিনামূল্যেই যৌনকার্য করে থাকে। যৌনকর্মীদের নিজস্ব কিছু সাইন বা ভঙ্গী রয়েছে। আঙ্গুল, চাহনী, বিশেষ হাটার ভঙ্গী, সম্বোধন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা খদ্দের ঠিক করে। যৌনকর্মীদের মধ্যে যারা দেখতে ভাল আর চালাক চতুর কিংবা

উচ্চাকাঙ্খী তাদের একটা স্বপ্ন থাকে বিদেশে গিয়ে এই কাজের মাধ্যমে অধিক আয় করার। মধ্যপ্রাচ্য কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নততর কিছু দেশ বিশেষত দুবাইকে তারা এই কাজের স্বর্গরাজ্য মনে করে। অধিকাংশ যৌনকর্মীদের একাধিক দালাল থাকে। সাধারণত দালালদের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন সময় কাজের খবর পায়। দালালদের আয়ও অনেক শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের চেয়ে অনেক বেশী হয়। সমাজের গভীরে অনেক রিক্রুটার চলাফেরা করে যাদেরকে আমাদের মত সাধারন মানুষেরা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারা যায় না। কারো কারো কথাবার্তা মমতাময়ী মেশানো কারো কারো বেশভূষা বেশ রুচিশীল, রীতিমত শিল্প সম্মত। এরা ঘুরে ফিরে খবর নেয় কারা স্বামীর সাথে অশান্তিতে আছে কিংবা যৌনতায় অসুখী, কারা চরমভাবে নিরূপায়, কারা উচ্চাকাঙ্খী, কারা যৌনতার দিক থেকে বহুগামীতার প্রত্যাশায় ব্যকুল ইত্যাদি। সুবিধামত ও বিভিন্ন মেয়াদী মোটিভেশান দিয়ে তারা নারীদের এই পেশায় টেনে নিয়ে আসে। ঠিক একই ভাবে কিছু খদ্দের আছে যারা নতুন কোন কুমারী মেয়ে এই লাইনে এলে খবর পেয়ে যায়। বিশেষত কিশোরী বা সদ্য তরুনীদের চাহিদা ব্যাপক বেশী। যৌনপল্লীতে কোন নতুন মেয়ে এলে কিছু খদ্দের আছে যারা দালালদের মাধ্যমে ঠিক খবর পেয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পনের-কুড়ি হাজার টাকাও তারা অবলীলায় খরচ করে ফেলে যৌনপল্লীতে আসা নতুন মেয়েটির সাথে যৌনকাজ করারা জন্য। একটু বয়েসী যৌনকর্মীদের চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। তখন তারা চার-পাঁচ জন কমবয়েসী মেয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হয়। প্রভাবশালী মহলে সর্দারনীরদের থাকে বিশেষ যোগাযোগ। সর্দারনীরদের হয়ে অনেকে দালাল কিংবা রিক্রুটার কাজ করে অর্থের বিনিময়ে নতুন মেয়েকে যৌনপল্লীতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন পেশাদার যৌনকর্মী একদিনে ১০ থেকে ১৫ জন খরিদ্দারের সাথে যৌনকার্য করতে থাকে। যৌনকর্মের এই যন্ত্রণা ভুলতে অনেক যৌনকর্মী নেশাদ্রব্য ও

নেশার ওষুধ গ্রহন করে থাকে। শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে গ্রাম্য দারিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা অনেক মেয়ে নিজের ইচ্ছাতেই কাজ করছে। কিন্তু এর পরেও ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় এখানে আইন বহির্ভূত কর্যক্রম যেমন ঘটে থাকে অনেক লোকাল মস্তান, ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী তারাও এসেও যৌনপল্লীর কোন ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাকছে।

জেলার যৌনপল্লীর পরিবেশ, যৌনকর্মীদের থাকার জায়গা নোংরা, সংকীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর। তাদের জন্য টিনের খুপড়ি কিংবা কামরা বরাদ্দ হলেও কয়েক জন কর্মী এবং খদ্দের মিলে একটা শৌচাগার ব্যবহার করেন। কামরার আশেপাশে, কন্ডোম, মদের বোতল স্তূপাকারে ছড়িয়ে থাকে। জল নিষ্কাষন এবং পয়নিষ্কাষন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল তাই সাধারণ পরিবেশ দূষিত। আবদ্ধ ও ছোট জায়গায় ধুমপানের ফলে নিশ্বাসের কষ্ট। এই ভাবেই চলতে থাকে যৌনকর্মীদের দৈনন্দিন যাপন। শান্তিপুর ও বাহাদুরপুর যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের যৌনপল্লীতেবাস/কর্মযোগ্যতা নিয়ে কথা বলতে গেলে বলা যায় যে যৌনকর্মীরা এখানে অস্বাথ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। শান্তিপুর যৌনপল্লীর পাশে রয়েছে একটা জলহীন পুকুর সেখানেই যৌনপল্লীর সমস্ত নোংরা ফেলা হয়। যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীর রাস্তার পাশেই জমা হয়ে আছে যৌন পল্লীর নানা নোংরা। যা বাহাদুরপুরের যৌনপল্লীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা স্বনির্ভর এবং নিজেদের উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে তারা তাদের জীবন চালচ্ছে। শান্তিপুরের যৌনপল্লীর মধ্যেই যৌনকর্মীদের জীবনধারনের জন্য মোটামুটি সব উপাদান বিদ্যমান, যৌনপল্লীর মধ্যে বাজার, দোকান পাট, বিউটি পার্লার, ফার্মেসি, মোটামুটি সবই সেখানে আছে। কিন্তু বাহাদুরপুর, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন যৌনপল্লীর ভিতরে সেইভাবে দোকানপাট গড়ে ওঠে নি এক্ষেত্রে যৌনপল্লী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয় যৌনকর্মীদের। তবে খুব দূরে যেতে হয় না যৌনপল্লীসংলগ্ন রাস্তার পাশেই গড়ে উঠেছে দোকানপাট। শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে এন.জিওদের পরিচালনায় যৌনকর্মীদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে।

যৌনকর্মীরা দিনে কতজন ক্রেতাকে সেবা প্রদান করেন তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকতার ওপর। অবস্থাভেদে সাধারণ যৌনকর্মীদের আয় দিনে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মতো আবার কেউ কেউ ১০০০ থেকে ২০০০ টাকাও তারা উপার্জন করে থাকে। চেহারা, বয়স, অবস্থান, নিয়মিত খদ্দের ভেদে এই আয়ের তারতম্য হয়। বয়স, চেহারা ও যৌনকাজে দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে ক্রেতা পরিমান মতো টাকার মাধ্যমে যৌনসেবা ক্রয় করে থাকে। যদিও এর একটা বড় অংশ চলে যায় ভাড়া, বিল, পোষাক ও সাজের পেছনে। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য যৌনকর্মীদের অর্থের একটা বড় অংশ পোষাক ও প্রসাধন সামগ্রীর জন্য খরচ করতে হয়। নিয়মিত ক্রেতাদের সাথে যৌনকর্মীদের একধরনের প্রেমের সম্পর্ক থাকে। তারা পরিচিত থাকেন বাবু বলে। যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রচলিত ধারনা হলো বাবুর সংসার থাকলেও তিনি তার নিয়মিত খরিদ্দার।

বাবু কোন একজন যৌনকর্মীর কাছে নিয়মিত যৌনকার্য করতে আসলেও তিনি কিন্তু যৌনকর্মীর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। আবার অনেক সময় শোনাযায় যে বাবু প্রেমের নাম করে যৌনকর্মীর অর্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে থাকে। এবং বয়স কিংবা অন্য কোন কারণে কর্মীর উপার্জন কমে গেলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়
যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অধিকার: আইন, স্বাস্থ্য

জেলার যৌনকর্মীরা অধিকার বঞ্চিত যৌনকর্মী, শহরে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মতো অধিকারের দাবীদাওয়া নিয়ে তারা এত মাতামাতিও করে না। জেলার যৌনপল্লীগুলিতে রয়েছে গ্রামীনতার ছাপ। ফলে এখানে রয়েছে সংস্কারআচ্ছন্নতা। আর শান্তিপুর, বাহাদুরপুরের মতো যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা উঠে এসেছে গ্রামীন দরিদ্র পরিবেশ থেকে। এরা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য নানা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে আজ এই পেশাতে রয়েছে। আর এই রকম পরিস্থিতে তাদের দাবী শোনার মতও কেউ নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে দুর্বার মহিলা সম্বন্বয় কমিটি তাদের পাশে এসেছে এবং তাদের দাবী বা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। যৌনপল্লীর মধ্যে মাস্তান, সর্দারনী, বাবু (যৌনকর্মীদের ভালবাসার লোক) বাড়ীওয়ালা সহ পুলিশও, যৌনকর্মীদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। মাস্তান, সর্দারনীর এমনকি পুলিশকে প্রত্যেক যৌনকর্মীকে দিতে হয় বড় অঙ্কের মাসোহারা। রয়েছে মিথ্যা ও হটকারিতামূলক মামলার ভীতি প্রদর্শন। যৌনকর্মীদের সাথে আলাপ চারিতায় জানাগেছে, ১৮ বছরের কম বয়স্ক শিশুরাও এখানে যৌনকর্মের সাথে যুক্ত। এদের উপর রয়েছে বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রন।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে। প্রার্থীর কাছেও যাবে তাঁরা। দুর্বারের সচিব, যৌনকর্মী ভারতী দে-র কথায়, 'ইস্তাহারে রাজনৈতিক দলগুলি অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। আমরা চাই, যৌনকর্মীদের দাবি মানার প্রতিশ্রুতিও দিক ওরা। ভোটের

পর আমাদের দাবি নিয়ে দিল্লিতে লড়াই করার কথা যে দল বলবে, ভোটের সময় সেই দলেরই পাশে থাকব আমরা।'[২৬] যৌনকর্মীদের দাবিগুলি অবশ্য বহু পুরোনো। দীর্ঘদিন লড়াই করেও জয় আসেনি। দুর্বার মহিলা সম্বন্বয় কমিটির দাবী, ইমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্টের (আইপিটিএ) বেশ কয়েকটি ধারা বাতিল হোক। তাঁদের অভিযোগ, ভারতে যৌনবৃত্তি বেআইনি নয়। কিন্ত এই ধারাগুলি যৌনকর্মীদের বিপক্ষে যাচ্ছে, আদতে হাত শক্ত করছে পুলিশ ও গুন্ডাদের। বছর দুই আগে ১৫০ বছরের পুরোনো শান্তিপুরের যৌনপল্লির সব ক'টি ঘর সিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রানাঘাটের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ঘরগুলি খুলে দেওয়া হয়। অনেক দিন ঘরছাড়া যৌনকর্মীরা তাদের ঘরে ফিরে আসে, যৌনপল্লীতে আবার কাজকর্ম শুর হয়। একটি গোষ্ঠি তাদের স্বার্থ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যৌনপল্লীটি উচ্ছেদে বিগত কয়েক বছর যাবৎ তৎপর রয়েছে। বিনা কারনে পূর্ণবাসন ব্যতীত এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অমাণবিক ও অসাংবাধানিক। বিভিন্ন কারনে যৌনপেশায় অনেক নারী জড়িত হলেও তাদের সকলেই চায় মর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে বাঁচতে।

দুর্বারের সভানেত্রী সীমা ফোকলার বক্তব্য, 'প্রোমোটারদের সুবিধা করে দিতেই আইপিটিএ-র ৭ ও ১৮ নম্বর ধারার অপব্যবহার করছিল প্রশাসন। এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। যৌনকর্মী মা তাঁর ১৮ বছরের বড় সন্তানের ভরণপোষণ করতে পারেন না। কারণ, আইনের ৪ নম্বর ধারা সেই সন্তানকে অপরাধী বলে গন্য করে। নারী ও শিশু পাচার বিরোধী আমরাও। সে দিকে খেয়াল রেখেই চাইছি এই ধারাগুলি বাতিল করা হোক।' যৌনকর্মীদের দ্বিতীয় দাবি, তাঁদের

[২৬] এই সময়, পত্রিকা ১০ মার্চ, ২০১৪।

কাজকে শ্রমতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দিতে হবে বিনোদন কর্মীর স্বীকৃতি। তৃতীয়ত, বিভিন্ন পল্লিতে যে স্বশাসিত বোর্ড কাজ করছে, তারও সরকারি স্বীকৃতি চায়। গত ১৮ বছরে প্রায় ৯৫০ নাবালিকা ও অনিচ্ছুক মহিলাকে বিভিন্ন পল্লি থেকে উদ্ধার করেছে এই বোর্ড। ভারতীদেবী বলেন, 'প্রতিবার ভোটের সময় নেতারা ভোট চাইতে আসেন। আমরা আমাদের কথা বলি। তখন সব শোনেন তাঁরা, কিন্তু ভোটের পর কাউকে কোনও কথা বলতে শোনা যায় না। তাই আমরা চাইছি, দলগুলি আমাদের দাবির কথা ইস্তাহারে লিখুক।'[২৭] অতীত বলছে, ১৯৯৮ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে আইপিটিএ-তে সংশোধনী আনার আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপি। পরে অবশ্য যৌনকর্মীদের বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করেনি গেরুয়া শিবির। ২০০৬ সালে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী রেণুকা চৌধুরী আইনে বেশ কয়েকটি সংশোধন আনার প্রস্তাব দিয়েছিলো। সেগুলির অধিকাংশ যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধেই যায়। বিতর্ক হওয়ায় সেই বিল আর সংসদে পাশ হয়নি। ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনের সময় যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তাঁদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বলা হয়েছে, বয়স্ক যৌনকর্মীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হবে। ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও। কিন্তু যৌনকর্মীদের মূল তিন দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারও বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি। যৌনকর্মীর সন্তান মৃণালকান্তি দত্তের কথায়, 'সরকারি প্রকল্পগুলি অবশ্যই ভালো। কিন্তু যৌনকর্মীদের উপর চলা অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্যই মূল সমস্যা। তাই সে দিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।' কলকাতা পুরসভার মেয়র থাকাকালীন সুব্রত মুখোপাধ্যায় যৌনকর্মীদের লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে সওয়াল

---

[২৭] এই সময়, সংবাদ পত্রিকা, ১০ মার্চ, ২০১৪।

করেছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সংবাদ মাধ্যম ‘এই সময়’কে বলেন, ‘যৌনকর্মীদের বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খুবই সহানুভূতিশীল। তার ইচ্ছেতেই প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয়েছে। ওঁদের যা দাবি, তা ওঁরা জানাতেই পারে। আমার কাছে জানালে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব।’ বাম সাংসদ রামচন্দ্র ডোম অবশ্য বলেন, ‘ইস্তাহারে সমস্ত কথা লেখার তো সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা ওঁদের পাশেই আছি।’ ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী কৃষ্ণা তিরথকে আইপিটিএ-র ধারা বাতিল ও সংশোধনের দাবি নিয়ে যে চিঠি বাম প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, তাতে সই ছিল বোলপুরের সাংসদেরও। ঘাটাল কেন্দ্রের কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী মানস ভুঁইঞা মনে করেন, যৌনকর্মীদের দাবি যুক্তিযুক্ত হলে প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। তাঁর কথায়, ‘ওঁরা সত্যিই দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে।’ উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায় বলেন, ‘দলের রাজ্য ইস্তাহার কমিটির সদস্য আমি। ওঁদের চিঠি পেলে কমিটি তো বটেই, শীর্ষ নেতৃত্বকেও দাবির কথা জানাব।’

দুর্বারের হিসেব বলছে, রাজ্যে প্রায় ৬৫ হাজার যৌনকর্মী রয়েছে তাঁদের সংগঠনে। পরিবার ধরলে অন্তত দু’-আড়াই লাখ ভোটার। দুর্বারের মুখ্য উপদেষ্টা স্মরজিৎ জানার আক্ষেপ, ‘ভোটাররা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন। সেটাই সমস্যা। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় হলে, ভোটের প্রয়োজনেই হয়তো আমাদের দাবি মেনে নিত রাজনৈতিক দলগুলি। ভোটের সময় ভোটের অঙ্ক থাকবেই। কিন্তু যৌনকর্মীরা চান, সহানুভূতি নিয়েই তাঁদের পাশে দাঁড়াক দলগুলি। কিন্তু শান্তিপুরের যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবই প্রকাশ করে থাকেন শান্তিপুরের পুরপ্রধান। শান্তিপুরের যৌনপল্লিতে পুরপ্রধানের উদ্যোগে পালিত হয়েছে রাখিবন্ধন। পৌরসভার উদ্যোগে যৌনপল্লীর নাগরিকদের নিয়ে রাখিবন্ধনের আয়োজন করা হয়। তিনি

যৌনপল্লীর বাসিন্দাদের হাত থেকে রাখি পড়েন। ছিলেন অন্যান্য কাউন্সিলারেরাও। সঙ্গে সঙ্গে চলে মিষ্টিমুখও। মূলত সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরির উদ্দেশেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, "এখানকার বাসিন্দারা যাতে মনে না করেন, তাঁরা সমাজের চেয়ে কোনও আলাদা অংশ। এই মানুষগুলি যেন সমাজের মূলস্রোতের শরিক হয়েই যাবতীয় সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।" সুনাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের এই কথাটি সকলকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি সম্প্রীতির পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিতেও জোর দেন।

স্বাস্থ্য: শান্তিপুরের যৌনপল্লীতে অনেক মেয়েরা নিজের ইচ্ছাতেই কাজ করছে বিশেষত গ্রাম্য দারিদ্র পরিবার থেকে এসে, ঝুকিপূর্ণ ওষুধ সেবন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, কন্ডোম ছাড়া অনেক খরিদ্দারের সাথে যৌনকার্য করতে হয়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে জেলার যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের শরীরে বিভিন্ন অসুখের সৃষ্টি হয়। এছাড়া কাজের চাপে ঠিক সময় মতো খাওয়া হয় না, যৌনপল্লীতে আসার আগে বাড়িতে অর্থনৈতিক অভাবের কারনেও পুষ্ঠিকর খাবারও যৌনকর্মীরা পাইনি তাদের চেহারা দেখে বোঝাযায়। জেলার যৌনকর্মীরা শারীরিকভাবে দুর্বল ফলে দুর্বল শরীরে সহজেই রোগ বাসাবাধে। শান্তিপুর, বাহাদুরপুরের যযৌনপল্লীর যে সব যৌনকর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ যৌনকর্মী কোন না কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত। যৌনকর্মীরারা প্রবলভাবে অসুস্থ হলে সেই সময় তারা হাসপাতালে দেখাতে আসে, তার আগে পর্যন্ত তারা তাদের দেহে বাহিত সংক্রম নিয়েও যৌনকাজ করে থাকে।

শান্তিপুরের যৌনকর্মীরা নিজেদের চিকিৎসার জন্য শান্তিপুর হাসপাতালে গিয়ে থাকে।[২৮] আর বাহাদুপুরের যৌনকর্মীরা চিকিৎসার জন্য কৃষ্ণনগরের সদর হাসপাতালে যায়।[২৯] শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, এবং মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন ভাগীরথীর পাড়ে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীতে, গাজা, হিরোইন, মদসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। নেশা জাতীয় দ্রব্য সব যৌনপল্লীরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যৌনকর্মীরাও ব্যপকভাবে মাদক আসক্ত হয়ে থাকেন। অতিরিক্ত পরিমানে নেশা করার ফলে যৌনকর্মীরাও ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হন। যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা এবং অক্ষমতা

যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক অজ্ঞতা, অসচেতনতা এবং অক্ষমতা তাদের মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। যৌনপল্লীর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ তো আছেই সাথে আছে আরো কিছু সমস্যা। জেলার যৌনপল্লীতে সাধারণত যান মাঝারি ও নিম্নআয়ের মানুষেরা। সারাজীবন অভাবের সাথে যুদ্ধ করে অপুষ্টিতে ভোগা যৌনকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্যবান নারী হলো সৌন্দর্যের প্রতীক। তাছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্কদের বয়স্ক দেখানোর জন্য স্বাস্থ্য ভালো দেখানোর দরকার পড়ে। নিজেদের স্বাস্থ্যবতী দেখানোর জন্য এবং সর্দারনীর/মাসীর নির্দেশে যৌনকর্মীরা গ্রহন করেন ওরাডেক্সন নামের একধরনের ট্যাবলেট। [৩০] যৌনকর্মীদের ভাষাতে "ওরাডেক্সন ব্যবহারের ফলে তাদের বুক এবং

---

[২৮] ক্ষেত্র সমীক্ষা, শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- শেফালী মাহাতো, বয়স ৫৮, ঠিকানা- বড়োবাজার, শান্তিপুর, বর্তমান বাসস্থান-শান্তিপুরের যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩.২.২০১৯

[২৯] ক্ষেত্র সমীক্ষা, বাহাদুর যৌনপল্লী, তথ্য প্রদাতার নাম- যমুনা দুর্লভ, বয়স ৫০, ঠিকানা- নাকাশি পাড়া, বর্তমান বাসস্থান- বাহাদুর যৌনপল্লী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১০.২.২০১৯

[৩০] যৌনলয়ে এসব অল্পবয়সী ভগ্নস্বাস্থ্য ও শীর্ণকায় মেয়েদের নিয়মিত ওরাডেক্সন সেবন করতে দেয়া হয়। নিয়মিত ওরাডেক্সন গ্রহণ করলে কিছুদিনের মধ্যে এসব মেয়ের স্বাস্থ্যে পরিবর্তন আসে।

কোমর ভারী দেখায় যা খদ্দেররা পছন্দ করে। তাদের চাহিদা বাড়ে ফলে বেশি টাকা রোজগার করতে পারে।" কেউ কেউ নিজেই চাহিদা বাড়ানোর জন্য ঔষধ গ্রহণ করে। যেভাবেই শুরু হোক না কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঔষধ যৌনকর্মীদের শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকরে যা যৌনকর্মীদের জীবনকে ভয়াবহ করে তোলে। ট্যাবলেট খাওয়ার ফলে হরমোন সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, চামড়ার সমস্যা, লিভারের ক্ষত এই সব মারাত্মক অসুখের জন্ম হতে পারে। জেলার যৌনপল্লীর সাথে গড়ে ওঠা দোকানগুলিতে সহজেই মেলে স্টেরয়েড ট্যাবলেট সহজলভ্য এবং সস্তা। অপরিচ্ছন্ন যৌন মিলন ও কন্ডোম ব্যবহারে খদ্দেরের অনাগ্রহের কারণে কর্মীরা খুব সহজেই সিফিলিস, গনোরিয়ার, ক্ল্যামাইডিয়ার সংক্রমনের মতো রোগের স্বীকার হতে হয়। অনেক যৌনকর্মী অল্প বয়সে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে। অসুখ চিকিৎসার অযোগ্য পর্যায়ে চলে গেলে বা চিকিৎসার মাধ্যমে অসুখ ভালো না হলে অনেক সময় সেই অসুস্থ যৌনকর্মীকে পল্লী থেকে বের করে দেওয়া হয়। যদি আশেপাশে কর্মরত কোন এন.জিও থাকে তাহলে সে অসুস্থ যৌনকর্মীদেকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক সময় যৌনকর্মীরা তাদের খদ্দের হারানোর, আশ্রয় হারানোর ভয়ে অথবা সর্দারনীর ভয়ে তাদের যৌনরোগ একদম শেষ অবস্থায় যাওয়া পর্যন্ত গোপন রাখে এবং ভোগ করে অপরিসীম যন্ত্রনা। যৌনকর্মীরা অনেকেই HIVর ঝুঁকির মধ্যে আছে। তাছাড়া ক্রেতারা অসন্তুষ্ট হবার ভয়ে অনেক যৌনকর্মী কন্ডোম ব্যবহারের ব্যাপারে জোর করা থেকে বিরত থাকে। এতে রোগের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে হাঁপানি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপতো আছেই। বিড়ি, সিগারেট, অ্যালকোহলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তাদের অসুস্থ্যতা বাড়ায়। যৌনকর্মীরা নিজেদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখার কোন সুযোগ পান না। তাই সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের মানসিক

অবসাদ, মনোবৈকল্য, স্মৃতিশক্তির সমস্যায় ভোগেন তারা। বিভিন্নরকম বিষাদম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। এই পেশা ছাড়া আর কিছু করার যোগ্য মনে করেন না নিজেকে। তাই চাইলেও এই পেশা ছাড়তে পারে না।

এক সময় ভারতবর্ষে যৌনপেশা সংক্রান্ত আইন ছিল সিটা বা Suppression of Immoral Traffic Act, 1956।[৩১] ১৯৮৬ সালে সেটি পরিমার্জনা করে পিটা বা আই টি (পি) আইন, 'Immoral Traffic (Prevention) Act, 1986' প্রণয়ন করা হয়। সিটা দেহব্যবসাকে অবলুপ্ত (abolition) করার চেষ্টা করেনি, কিন্তু সেটাকে দমন করতে চেষ্টা (suppresion) করেছিল। পিটার লক্ষ্য দেহব্যবসাকে দমন নয়, তার পরিবর্তে সেটার প্রতিরোধ (prevention)। পিটা আইনে জীবিকা হিসেবে যৌনপেশাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পণ্য হিসেবে ইচ্ছেমত বাজারে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই আইন অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যবসা চালানো যেতে পারে। নিয়মাকানুন বা শর্তগুলি এই আইনে বিশদে বলা আছে। এই আইনে যৌনপল্লীতে কেউ যৌনপেশা চালাতে পারবে না। বস্তুত, যৌনপল্লীর (brothel) মালিক হওয়া বা সেটি চালানো, বা জেনেশুনে বাড়িওয়ালার বা ভাড়াটের অন্য কাউকে যৌনপল্লী চালাতে দেওয়া এই আইনে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি একটি মেয়ে নিজের জীবনধারণের জন্য কোনো জায়গায় যৌনবৃত্তি চালায় যে জায়গার রক্ষণাবেক্ষণে অন্য কোনো লোক বা যৌনকর্মী জড়িত নয়, তাহলে সেই জায়গা যৌনপল্লী বলে ধরা হবে না। এ ছাড়া যৌনবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীকে যে সব শর্ত পালন করতে হবে তার অনেকগুলি

---

[৩১] THE SUPPRESSION OF IMMORAL TRAFFIC IN WOMEN AND GIRLS ACT, 1956, ACT NO.104 OF 1956

সংক্ষিপ্ত ভাবে পিটা আইন-এ আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি শর্ত নিয়ে অনেক বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি বাস্তবোচিত নয় বলেই অনেকে দাবী করেছেন। বিতর্কিত শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে, দেহব্যবসার রোজগারের উপরে পরিবারের সদস্যদের নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে না থাকা। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জায়গায় যৌনকর্ম না করা এবং তার জন্য প্ররোচিত না করা। যৌনপেশা জন্য খদ্দেরকে আমন্ত্রণ না জানানো। বাসস্থান বা জনসাধারণের ব্যবহৃত বা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের ২০০ মিটারের মধ্যে যৌনকর্ম না করা।

মুশকিল হল বহু নারীই দারিদ্রের জ্বালায় নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই যৌনপেশাকে বৃত্তিহিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই এঁদের পারিবারিক দায়দায়িত্ব থাকে। কিন্তু যেহেতু পিটা-র একটি ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের উর্দ্ধে কোনো ব্যক্তিই সেই নারীর অর্জিত আয়ের উপর আংশিক বা পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে বৃদ্ধ বাবা-মা ও অন্যান্য যাঁদের জন্য নারীটি এই বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে তাঁদের, আইনত তিনি সাহায্য করতে পারবে না। এটা মানবিক দিক থেকে কতটা সমর্থনযোগ্য সেটা প্রশ্ন। এই আইনে যৌনবৃত্তি চালানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জায়গায় যৌনবৃত্তি চালানোর অধিকার দেওয়া হয় নি। যেখানে লোক চলাচল নেই সেখানে লোককে আনতে হলে যেখানে লোক চলাচল আছে সেখানে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। কিন্তু খদ্দেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংগ্রহ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ এটিকে বৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, সেই বৃত্তিতে সফল হবার সুযোগ এতে বিশেষ দেওয়া হয়নি। এক দিক থেকে বিচার করলে এটাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনে যৌনপেশাকে বে-আইনী করা হল না বটে, কিন্তু শর্ত মেনে চলতে হলে যৌন ব্যবসায় সফলতা ক্ষীণ। এগুলো অবশ্য আইনের দিক। আইনত যা হওয়া

উচিত আর বাস্তবে যা ঘটছে - তা সব সময়ে এক নয়। দেহব্যবসা দুর্গম জায়গায় দুয়েকজনের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন ব্যবসা নয় - এটি বহু ক্ষেত্রেই সংগঠিত এবং এর বিশালত্ব বা বিস্তৃতি উপেক্ষণীয় নয়। নারী-পাচার চক্র ভারতবর্ষে প্রবল ভাবে সক্রিয়। বহু প্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের পাচারকারীরা নিয়মিত ধরে এনে জোর করে এই ব্যবসায় নিয়োজিত করছে। তার কিছু কিছু খবর পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে; অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারীরা ধরা পড়ে এবং শাস্তিও পায়। মাঝেমধ্যে যৌনালয়ে, বিশেষ করে যেগুলো তথাকথিত লাল-বাতি অঞ্চলের বাইরে, পুলিশ রেডের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে যৌনকর্মীরা ও যৌনপল্লীর পরিচালকরা শাস্তি পেলেও তাদের খদ্দেরদের শাস্তি দেওয়া হয় না, হলেও দেওয়া হয় নামমাত্র। এ ব্যাপারে কিছু কিছু সংশোধনী প্রস্তাব (যেমন, খদ্দেরদেরও সম পরিমান শাস্তি দেওয়া) সরকারের বিবেচনাধীনে আছে। এটা অনস্বীকার্য যে, নানাবিধ কারণে পিটা আইন সামগ্রিকভাবে কার্যকরি করা সম্ভব হয় নি। যখন কোনো আইন থাকে, কিন্তু সেটা কাজে পরিণত হয় না, তখন সেই আইন সম্পর্কে সাধারণের মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ - সে ব্যাপারে অনেক সময়েই সংশয় থাকে। পিটা আইনও তার ব্যতিক্রম নয়।

চতুর্থ অধ্যায়
যৌনপল্লীর বাইরের ও ভিতরের নেটওয়ার্ক

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজি, পণ্য ও প্রযুক্তির মত পৃথিবী জুড়ে শ্রমের চলাচলও সহজ হওয়ার কথা। কিন্তু জটিল ইমিগ্রেশন নীতির কারণে গত শতাব্দিগুলোর তুলনায় বতমান সময়ে বৈধ পথে শ্রম অভিবাসন অনেক কম ঘটেছে। তবে পৃথিবী জুড়ে মানুষের চলাচল থেমে থাকেনি। নানা অবৈধ উপায়ে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করছে। বিভিন্ন ধরণের অনিয়মিত চলাচলের মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো নারী ও শিশু পাচার। আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশু পাচারকে আধুনিকযুগের দাসপ্রথা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাচার প্রতিরোধে সকলে একমত হলেও পাচার কাকে বলে–এ বিষয়ে বড় ধরণের বিভ্রান্তি রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি সবই আগের তুলনায় অনেক জটিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত অভিবাসন অনেক সময় পাচারের মত ফলাফল তৈরি করছে।

সাধারণত, যে কোন ধরনের শোষণের উদ্দেশ্যে জোড় খাটিয়ে, ছল চাতুরী, ভয় ভীতি প্রদর্শন করে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা যাকে পাচার করতে চায় তার ওপর কতৃত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিকে আইন বহির্ভূত উপায়ে টাকা দেওয়া নেওয়া করার মাধ্যমে লোক সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যেকোন কর্মকান্ডকে পাচার বলে গন্য করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল অগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এর ব্যাখ্য অনুযায়ী মানুষ পাচার তখনই ঘটে যখন একজন অভিবাসী জাতীয় অথবা আর্ন্তজাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে (চাকুরি প্রাপ্তির নিমিত্তে, অপহৃত হয়ে, বিক্রিত হয়ে) কোন কাজে নিযুক্ত হন।

পাচারকারী এই কর্মকান্ডের যেকোন পযায়ে উক্ত অভিবাসীকে প্রতারণা, পীড়ন বা অন্য যেকোন শোষণের মাধ্যমে তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে অথনৈতিক বা অন্য যেকোন প্রকার মুনাফা অর্জন করে।

জেলার যৌনপল্লী গুলিতে মেয়েদের আগমন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নারী পাচার এর বিষয়টি অনিবার্য ভাবেই অলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। আর যৌনপল্লীর বাইরে ও ভিতরের নেটওয়ার্ক কথা আলোচনা করতে গেলে পাচার ও দালালদের বিষয়টিও আলোচনার প্রয়োজন হয়। জেলার যৌনপল্লীগুলিতে যে মেয়েরা রয়েছে তাদের অধিকাংশের পরিবারই দুস্থ, নিঃস্ব ও অসহায়। আর এ পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিকভাবে সংঘবদ্ধ এক শ্রেণীর প্রতারক। তারা প্রলোভন দেখিয়ে অসহায় পিতামাতার মেয়েদের শহরে চাকুরি বা যৌতুকহীন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাচার করে দিচ্ছে অন্ধকার জগতে। পাচারকারীদের প্রলোভনের শিকার হচ্ছে দেশের ছিন্নমূল, ভবঘুরে নারী ও দারিদ্র্যের নিষ্পেশনে জর্জরিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীরা। অসহায় নারীরা সুন্দরভাবে বাঁচার আশায় নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাচারকারীদের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ছে। পিতা-মাতারা অর্থ উপার্জনের আশায় বেশি বেতনের চাকরীর প্রলোভনে পড়ে বা মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় না জেনেই তাদের সন্তানদের তুলে দিচ্ছে পাচারকারীদের হাতে। এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে পাচারকারীরা পিতামাতার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে শিশুদের চুরি করে পাচার করে দিচ্ছে। যেসব কারণে পাচারকারীরা সহজে নারী ও শিশু এবং শিশুদের অভিভাবককে প্রতারণা করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে রয়েছে:-

১। দারিদ্র্য

২। সীমান্ত অতিক্রমের সহজ প্রক্রিয়া

৩। সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন

৪। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব

৫। পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতা

দারিদ্র্য

দৈনিক পত্রিকা থেকে নারী ও শিশু পাচারের সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর পেছনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যতম কারণ হিসেবে নিহিত রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নারীর নিম্নমানের পেশা, চাকরীর সুযোগের অভাব, মাথাপিছু নিম্ন আয়, সম্পদে নারীর অনধিকার, চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাব ইত্যাদি। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের চরম পরিস্থিতিতে দরিদ্র নারী এবং তাদের পরিবার বিয়ে ও চাকুরির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়। সাধারণত, দেখা যায়, যে এলাকার নারী-পুরুষরা পাচারের শিকার হয় সেই এলাকার লোকজন অত্যন্ত দরিদ্র, সেখানে ভূমিহীনদের সংখ্যাধিক্য, খাদ্যাভাব এবং চরম বেকারত্ব বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে এসব এলাকার পিতামাতারা নগদ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এমন কারো কাছ থেকে পরিবারের নারীদের জন্য বিবাহ বা চাকরির প্রস্তাব পেলে তা গ্রহন করতে দেরি করে না। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ভোগ্যপণ্য পাওয়ার লোভে পাচারকারীরা নিজেদের নিপুণভাবে পরিচালনা করে থাকে এবং এটা পর্যায়ক্রমে তাদের উচ্চাকাঙক্ষা বৃদ্ধি করে যার ফলাফল হিসেবে অসংখ্য নারী পাচারের শিকার হয়।

সীমান্ত অতিক্রমের সহজ প্রক্রিয়া:

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ১৯৪৭ সালে এবং পুণরায় ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক বিভাজন এই এলাকার পরিবারগুলোকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দেশ বিভাগের কারণে এই বিভক্ত পরিবারগুলোর সদস্যরা একে অন্যকে সীমান্তের একপার হতে অন্য পারে আনা-নেওয়ার কাজে নিয়োজিত। সীমান্ত অতিক্রম করে এক পরিবারের সদস্যরা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যুক্ত হওয়ার বাসনায় অনেক সময় নারী পাচারকে ত্বরান্বিত করে। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী অঞ্চলের বিভক্ত পরিবারগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। রাজশাহীতে বসবাসরত অনেক পরিবারের সদস্যই সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে তাদের আত্মীয়স্বজন বা দেশ ভাগের সময় থেকে যাওয়া পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে দেখা করতে যায়। সীমান্ত পার হয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় নারী ও শিশুরা অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত হয়। এছাড়া, অভিবাসন কতৃপক্ষের অনুমতি এবং বৈধ কাগজপত্র ব্যতিরেকে বিভিন্ন কারণে যেমন আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ, চিকিৎসা পণ্য চোরাচালান ইত্যাদির জন্য ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় যাওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়।

সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন

নারী পাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ হলো পরিবারে নারীর অধস্তন অবস্থান যা সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের

সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান তার বৈবাহিক অবস্থা দ্বারা নিধারিত। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের পিতামাতারা মেয়েদের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বিয়ের উপযুক্ত বয়স ১৮ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের বিয়ে দেওয়া দায়িত্ব বলে মনে করে যার দুটি খারাপ পরিণতি রয়েছে। যেসব ছেলে বিয়েতে যৌতুক চায় না কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতামাতারা তাদের সাথে খোঁজ-খবর ছাড়াই কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে। অনেক পাচারকারী এই দূর্বলতার সুযোগ নেয়। তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে বিদেশে পাচার করে দেয়। দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সহায়সম্বলহীন পিতামাতা বিয়ের সময় যৌতুকের দাবী মেনে নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে কিন্তু পরবর্তীকালে আর দিতে পারে না। তখন মেয়েটি তার স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। একদিকে মেয়েটি বাবার বাড়িতেও ফিরে যেতে পারে না, অন্যদিকে নির্যাতনের নির্মমতা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এরকম অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয় পাচারকারী চক্র। বিয়ের পর স্ত্রী রেখে পালিয়ে যাওয়া এবং বৈবাহিক সন্ত্রাস পাচারের কারণ হিসেবে কাজ করে। যুবতী, অবিবাহিত, অথবা স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা নারী সমাজ ও পরিবারের কাছে বোঝাস্বরূপ। এই নারীদের কাছে বিকল্প কর্ম অথবা বিবাহের প্রস্তাব আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তারা পাচারকারী চক্রের সদস্যদের বিবাহ বা লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাবে সহজেই সাড়া দেয় আর শেষ পর্যন্ত পাচারকারীদের পাতা জালে আটকা পড়ে।

শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব

স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও তথ্যের ঘাটতি নারী পাচারের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সর্বোপরি, আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্যশক্তি

অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। সীমান্ত অতিক্রমের নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া ইত্যাদির এর সাথে সমন্বয় ঘটে থাকে। দারিদ্র ও বেকারত্বের চরম পরিস্থিতিতে দরিদ্র নারী এবং তাদের পরিবার বিয়ে এবং চাকুরীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়। পাচারের শিকার এই নারীদের বেশির ভাগই চাকরি অপেক্ষা বিয়ের প্রস্তাবেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল তা বোঝা যায় জেলার যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের সাক্ষাতকার থেকে। অজ্ঞতার কারণেই পাচারের পথে গিয়েছিল। আর তাদেরকে বাধ্য করা হয় যৌনবৃত্তি, বিয়ে, গৃহপরিচারিকা, ক্ষুদ্র শিল্প, কারখানার শ্রমিক, নির্মান শ্রমিক এবং এ জাতীয় আরো অনেক নির্যাতনমূলক পেশায় কাজ করতে। জন্ম নিবন্ধন না থাকায় পাচার হওয়া নারীদের বয়সের কোন রেকর্ড থাকে না এবং মেয়েদের বিয়ের জন্য আইন নির্ধারিত ন্যূনতম বয়স হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে, বিবাহ নিবন্ধন না থাকার দরুন স্বামীর পরিচয়, সামাজিক অবস্থান এবং বর্তমান আবস্থা কিছুই জানা যায় না এবং তথাকথিত স্বামীকে খুঁজে বের করাও সম্ভব হয় না। অন্যদিকে নারীদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন বা গ্রামবাসীর মাধ্যমে শহর অঞ্চল, মধ্যবিত্ত পরিবার ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ দেয়ার নাম করে নিয়ে আসা হয়। প্রায়ই তাদের পিতামাতারও অন্যান্য বিষয়ে কিছু জানা থাকে না। চাকরিদাতা ও চাকরি বিষয়ক কোন নিবন্ধন না থাকায় নারী ও শিশুরা সহজেই তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া তারা যদি অন্য পেশায় অথবা অন্য স্থানে চলে যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং নিরক্ষরতা পরিবারে নারী ও মেয়ে শিশুদের নিম্ন অবস্থান ও বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিতামাতার অসাবধানতা ও অসর্তকতা:

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দারিদ্র এবং শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের সাথে সাথে পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতার কারণে প্রতিদিন অনেক নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। পাচারকারীরা নারী ও শিশু পাচারের জন্য বিভিন্ন প্রতারনামূলক কৌশল অবলম্বন করে। পিতামাতাকে বেশি বেতনে চাকরির কথা বলে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে শিশুদের পাচার করে নিয়ে যায়। ছোট শিশুদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বাবা-মার অজান্তেও অনেক সময় চুরি করে নিয়ে যায়।

এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, নদীর ভাঙন, বন্যা, ঘূর্নিঝড়, অত্যধিক জনসংখ্যা, ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, আয়ের স্বল্পতা, পিতামাতার সন্তান লালন-পালনে অক্ষমতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, প্রেমে ব্যর্থতা, উচ্চাকাঙ্খা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, স্বল্পকালীন চাকরি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দূনীতি ইত্যাদি কারণ পাচারের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। দৈনিক পত্রিকার সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নারীদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়-১. যৌনবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, ২. পর্নোগ্রাফি সিনেমায় ব্যবহার করা, ৩.শরীরের রক্ত বিক্রি করা, ৬.অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে ব্যবসা, ৭. মাথার খুলি, কঙ্কাল রপ্তানি করা।

গোটা বিশ্ব জুড়েই রয়েছে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা গরীব ঘরের ছেলে, মেয়ে ও নারীদের পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে। তারা নারী পাচারের জন্য কতিপয় কৌশল অবলম্বন করে। যেমন-দেশ ও বিদেশে চাকুরির মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে,

জোরপূর্বক অপহরণ করে, খাবার-জামাকাপড় দেওয়ায় প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করে থাকে। কখনো পাতানো বিয়ের মাধ্যমে দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিশোরী ও যুবতীদের ফাঁদে ফেলে। কোন কোন পাচারকারী চক্র শিক্ষিত ও সুন্দরী মেয়েদের দূর্লভ বৃত্তি, ফেলোশিপ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির ওয়ার্ক পারমিট দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে। তারা পাচারকৃত নারীদের অনেক সময় যৌনপল্লীর ক্ষমতায় থাকা মেয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীসময়ে তারা সমাজে যৌনকর্মী হিসেবে চিহ্নিত হয়। অনেক মহিলা দারিদ্র ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে স্বেচ্ছায় এ যৌনকর্মের পেশায় এসে থাকে। অনেকে উন্নত জীবনের আশায় পাচারকারীদের প্রলোভনে পা দিয়ে দেশের বাইরে পাড়ি দেয়। বাংলাদেশ থেকে পাচারের যে উদাহরণগুলো পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বিমান যোগে কিছু পাচার হয়, তবে স্থল পথে সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমেই বেশি সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হয়। এদেশের সাথে ভারতের ৪,২২২ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৮ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। উত্তর-বঙ্গ সীমানা দিয়েই পাচার বেশি হয়। বাংলাদেশের পাচারকারীরা ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত ব্যবহার করে পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের পাচার করে। এছাড়া শিয়ালদহ রেল স্টেশন ও হাওড়া স্টেশন ও পাচারকারীরা ব্যপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার জন্য যশোরের বেনাপোল একটি অত্যন্ত সহজ ও সুপরিচিত রুট। এখান থেকে বাস ও ট্রেনের যোগাযোগ খুব ভাল হওয়ায় পাচারকরীরা খুব সহজেই কলকাতা পৌছে যেতে পারে। ভারতীয় পাচারকারী, হস্তান্তরিত নারী ও শিশুকে কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বাইয়ের যৌনলয়ে বিক্রি করে কিংবা সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করে। দীর্ঘকাল ধরে দেহ ব্যবসা এবং নারী ও শিশু বিক্রয়ের জন্য কলকাতা নিরাপদ স্থান হিসেবে পরিচিত। আর মুম্বাইকেও পাচারের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাচারকারী কারা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে দালাল ও পাচারকারী উভয়ই পরিপূরকের এর ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোন একটি মেয়েকে নিয়ে এসে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দিচ্ছে সেই ব্যক্তির কিন্তু যৌনপল্লীর ভিতরের নেটওয়ার্ক এর সাথে খুব ভালো পরিচয় রয়েছে। আবার যৌনপল্লীর যে দালাল যৌনকর্মীটির খরিদ্দারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তারও বাইরের নেটওয়ার্ক এর সাথেও পরিচয় রয়েছে। সে শুধু একজন যৌনকর্মীর খরিদ্দারই সংগ্রহ করে দেয় না, বাইরে থেকে নারী কে পাচার করে এনে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দিচ্ছে যৌনপল্লীর মালকিনের হাতে। আবার সেই মেয়ে যৌনকর্মী হয়ে গেলে তার জন্যও খরিদ্দারও সংগ্রহ করে আনছে। এক্ষেত্রে পাচারকারী আর দালাল বিষয়টি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ২০০৪ সালের নারী ও শিশু নিযার্তন দমন আইন অনুযায়ী, পাচারকারী সেই ব্যক্তি যে যৌনবৃত্তি বা নীতিবর্হিভূত বেআইনী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দ্যেশে কোন নারীকে যে কোন স্থান থেকে আনয়ন করে অথবা, বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করে অথবা, বেচাকেনা করে অথবা, ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দ্যেশে হস্তান্তর করে অথবা, একই উদ্দ্যেশে নারীকে তার দখলে, রাখে। উল্লেখিত কাজগুলোর যেকোন একটির সাথে জড়িত ব্যক্তি পাচারকারী হিসেবে অভিহিত হবে। পাচারকারী কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক ব্যক্তি এই কাজের সাথে জড়িত থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন মূল হোতা এবং দলাল থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজনও সহযোগী হিসেবে এ কাজে যুক্ত থাকতে পারে। বোঝার সুবিধার্তে প্রকৃতি অনুযায়ী পাচারকারী চক্রকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

১. মূল হোতা

২. দালাল

৩. সংগ্রহকারী

৪. সহযোগী

১. মূল হোতা:

যে ব্যক্তি পাচারের মূল ব্যবসা পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে পাচারকারী চক্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পাচার সংক্রান্ত অর্থের লেনদেন এবং পাচার প্রক্রিয়ারর প্রশাসনিক কার্যাবলী এই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। মূল হোতা যে দেশের নাগরিক সে দেশে তার কর্মক্ষেত্র বা দপ্তর থাকতে পারে আবার তার কর্ম এলাকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে অন্য দেশের পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে সে পাচার কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

২. দালাল:

দালাল হলো সেই মধ্যস্বত্ত্বভোগী যাদের দেশের ভিতরে বিভিন্ন এলাকার নেটওয়ার্ক আছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে এবং পাচারকারী চক্রের প্রতিনিধি অথবা পাচারকৃতদের ব্যবহারকারী সংগঠনের হাতে তুলে দেয়।

৩. সংগ্রহকারী:

দালালের নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে যেসব ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে লোক সংগ্রহ করে দেয় তাদেরকে বলা যেতে পারে সংগ্রহকারী। আরও ব্যাখ্যা করলে সংগ্রহকারী বলতে বোঝায় পাচারের কাজে নিয়োজিত সেই সব লোক যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সংগ্রহকারী সাধারণত নিজের গ্রাম থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে না, অন্যান্য গ্রাম থেকে তাদের সংগ্রহ করে থাকে। অপেক্ষাকৃত ছোট দালাল আবার নিজেই সংগ্রহকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন যৌনপল্লীতে কর্মরত নারীদের কেউ কেউ দেশে ফেরত আসে। কাজ এবং উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ গ্রাম বা এলাকা থেকে কিছু মেয়েকে সংগ্রহ করে যৌনপল্লীতে নিয়ে যায়। বিনিময়ে যৌনপল্লীর মালিকের কাছ থেকে কিছু অর্থলাভ করে। পাচারের পুরো পক্রিয়াটি সে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. সহযোগী:

পাচার একটি সংগঠিত চক্রের কাজ। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশ যেমন পরিবার, স্থানীয় নেতা, ব্যবসায়ী, পরিবহন শিল্পে কর্মরত লোক, স্থানীয় মাস্তান-এরা বুঝে অথবা নাবুঝে কিছু অর্থনৈতিক লাভের জন্য পাচারের কাজে সহায়তা করে। এই শ্রেণীকে নারী ও শিশু পাচারের সহযোগী বলা যায়। ২০০৪ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, এরাও পাচারকারীর সংজ্ঞায় পড়ে। পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা নারী ও শিশুর পরিবার থেকে শুরু করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পর্যন্ত এ ধরনের সহযোগী ব্যক্তিদের পাওয়া যায়।

৫. পরিবার:

একজন দালাল যখন সংগ্রহের কাজ করে তখন পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে জেনে শুনেও নারী বা শিশুকে পাচারকারীদের হাতে বা দালালদের হাতে তুলে দেয়।

৬. পরিবহন চালক এবং মালিক:

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত নারী ও শিশুদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের পরিবহন ব্যবহার করা হয়। যেমন রিক্সা, ভ্যান, বাস, নৌকা, ট্রাক ইত্যাদি। এ সকল যানবাহনের চালকরা জেনে বা না জেনে স্থানান্তরের কাজটি করে থাকেন। এরাও পাচারের সহযোগী।

৭. ঘাট মালিক:

নারী ও শিশুদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় এনে জড়ো করা হয়। এই এলাকাগুলো ঘাট নামে পরিচিত। ঘাট একটি মাঠ হতে পারে, নদীর তীর হতে পারে এমনকি একটি বাড়িও হতে পারে। স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন অবৈধ উপায়ে মানুষ পারাপারের লক্ষ্যে সহায়তা করার জন্য এই ঘাটগুলো ইজারা নেয়। নারী ও শিশু পাচারের জন্য এই ঘাটগুলো ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘাট মালিকগণ পাচারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

নারী ও শিশু পাচার একটি অবৈধ স্থানান্তর প্রক্রিয়া। নারী ও শিশুদের অপহরণ করে অথবা নানা রকম ছলচাতুরি ও প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে পাচার করা হয়। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের নীতি বহির্ভূত ও অমানবিক কাজে নিয়োগ করা হয়। পাচারকৃত কোন নারী বা শিশু ফিরে এলে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যার সম্মূখীন হয়। এক কথায় পাচার ভিকটিম-এর জীবনের সাথে সাথে পরিবার ও সমাজে ভয়াবহ ফলাফল তৈরি করে। পাচারকরীদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুরা বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার সম্মূখীন হয়। বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত নারীদের মূলত নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে বাধ্য করা হয়। যৌনবৃত্তি, রক্ষিতা, বাধ্যতামূলক শ্রম, ইত্যাদি।

যে পরিমাণ নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে তার সিংহভাগকে জোরপূর্বক যৌনবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। যৌনবৃত্তিতে পাচারকৃত মেয়েদের নিয়োগ নির্ভর করে তাদের বয়স ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর। শান্তিপুর, বাহাদুরপুর, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন অস্থায়ী যৌনপল্লীগুলিতে যে যৌনকর্মীরা রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু সেই ভাবে বাইরের দেশ থেকে পাচার হয়ে আসা মেয়ে নেই বললেই চলে। এই জেলা কেন্দ্রিক যৌনপল্লীগুলির বেশিরভার মেয়ের আর্থিক সংঙ্কটময় পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে তাদের আজ এই পরিনতি। আর বলা যায় যে আশে পাশের গ্রাম থেকে এবং পাশের জেলাগুলি থেকে প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তারা আজ এই যৌনপল্লীতে নিয়েছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। টাকার বিনিময়ে পাচারকারীরা একেকজন নারীকে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। এদের মধ্যে অনেক কিশোরীও রয়েছে। যৌনপল্লীতে প্রথম থেকেই নারীরা মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। যৌনবৃত্তিতে অংশগ্রহন করতে অস্বীকার করলে সর্দারনীর বা যৌপল্লীর মালিকদের হাতে তাদের নির্যাতিত

হতে হয়। তাদেরকে বদ্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়। স্বাস্থ্যগত ও মানসিক দিক বিবেচনা করলে যৌনপল্লীতে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারী অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা, ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আরো অনেক যৌনপল্লীআছে সে সব যৌনপল্লী কথা গবেষণাতে তুলে ধরতে পারি নি। শুধুমাত্র নদীয়া জেলার শান্তিপুরের বড়োবাজারে গড়ে ওঠা যৌনপল্লী এবং বাহাদুরপুরের যৌনপল্লী আর মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংলগ্ন ভাগীরথীর পারে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীর বিষয় নিয়ে গবেষণাকার্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই যৌনপল্লীগুলিতে অবস্থানরত কিছু যৌনকর্মীদের জীবনের নানা সমস্যার কথা, তাদের যাপিত জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথাগুলি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পেরেছি। এছাড়া পরিচিতি ঘটেছে যৌনপল্লীগুলির পরিবেশের সঙ্গেও ।

এই যৌনপল্লীগুলিতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে এই গবেষণায়। যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের জীবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বদল ঘটেছে। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেদিয়ে জীবন কে বয়ে নিয়ে চলেছে তারা। যৌনকর্মী হয়ে কাজকরে অর্থ-উপার্জনের মাধ্যমে আজও বেঁচে থাকার উপকরন সংগ্রহকরে চলেছে। এই জেলার যৌনপল্লীর যে যে যৌনকর্মীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের মধ্যে কিছু যৌনকর্মী এসেছে অন্য মানুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আর কিছু যৌনকর্মী এসেছে অর্থের অভাবে। যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীর কাজ করে নিজেকে যেমন বাঁচিয়ে রাখছে সেই সঙ্গে অনেকে নিজের পরিবারে আর্থিক যোগান দিয়েও পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ballhatchet, K. (1979) Race Sex and Class, Under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905. New Delhi: Vikas Pubilishing House Pvt.Ltd.

Banerjee, S. (1998) *Dangerous Outcast: The Prostitution in Ninteenth Century Bengal*. Kolkata: Seagull Book.

http://manushi.in/docs/196.%20Book%20Review%20-%20Dangerous%20Outcast.pdf

India sex workers get life cover, BBC News. (2008) Retrieved 22 May 2010, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7376762.stm

Kara, S. (1893) *Sex Trafficking Inside the Business Of Modern Slavery*. Columbia: Columbia University Press.

Rajan, R, S. (2003) *The Scandal of the State*. New Delhi: Pauls Press.

Sahni, R., Shankar, H., & Apte, V.K (eds). (2008) *Prostitution and Beyond An Analysis of Sex Work in India*. New Delhi: SAGE Publication.

Teela, S., O'Neill, M. & P, Jane. (2009) *Postitution: Sex Work. Policy and Politics*. New Delhi: SAGE Publication.

গঙ্গোপাধ্যায়, আরতী. (১৩৩১) *প্রসঙ্গ দেবদাসী*. কলকাতা: রত্নাবলী.

গুপ্ত, সৌমেন্দ্র কুমার. (১৯৯৬) *চেনা মুর্শিদাবাদঃ অচেনা ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: অমৃতা প্রকাশনী.

ঘোষ, প্রবীর. (২০১৭) *অপরাধ বিজ্ঞান.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং.

ঘোষ, বারিবদন. বারবনিতাদের গল্প.

চক্রবর্তী, সুধীর. (২০১০) *যৌনতা ও সংস্কৃতি.* কলকাতা: নবযুগ প্রকাশনী.

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ.* কলকাতা: নিউ এজ পাবর্লিশার্স

নন্দী, রাজীব. (২০১৭) *নিষিদ্ধ দ্বিপদী.* কলকাতা: পরিবার পাবলিকেশন.

নন্দী, সোমেন্দ্র চন্দ্র. (১৩৮৫) *বন্দর কাশিমবাজার.* কলকাতা: বঙ্গীয় নাট্যসংসদ প্রকাশনী.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক. & অন্যান্য. (২০০৫) *যৌনদাসী না যৌনশ্রমিক.* উৎস মানুষ: বিশেষ সংখ্যা. from http://www.utsomanush.com/BookCollection/JOUNO_SPL_05-pp1-26.pdf

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত. (২০০২) *অশ্রুত কণ্ঠস্বর, ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবনিতা সংস্কৃতি.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা.

বসু, দেবাশিস. (২০০১) *কলকাতার যৌনপল্লী.* ধ্রুপদ, বার্ষিক সংকলন. কলকাতা: ধ্রুপদ.

ভট্টাচার্য, মৌ. (২০১১) *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ. (১৯৮১) *অপরাধ জগতের ভাষা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

সিদ্দিকী, রতন. (১৯৯৭) *বারবনিতা.* কলকাতা: বিশ্বসাহিত্যভবন.